যোগ-সাধন

তৃতীয়ভাগ।

অর্থাৎ

প্রশ্বাচার-বিধি ও মন্ত্রযোগ।

কলিকাতা।

১৮ নং কৃষ্ণসিংহের লেন-- সাধনপ্রেসে

শ্রীভুবনমোহন দাস দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

১৩০২

বিজ্ঞাপন।

জগতের মঙ্গলের জন্য করুণানিধান ভগবান্ গুরুদেবের অনুজ্ঞা গ্রহণ করিয়া এই যোগসাধন তৃতীয়ভাগ বা পরমগুহ্য পশ্বাচার-বিধি প্রচার করিলাম।

অন্যত্র এই পশ্বাচারবিধিই পাশুপত-ব্রত ও মন্ত্রযোগ বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছে।

যোগসাধনের জন্য জ্ঞান এবং ক্রিয়া উভয়ই আবশ্যক।

যোগসাধন প্রথম ও দ্বিতীয়ভাগে প্রধানতঃ জ্ঞানের কথা বিবৃত হইয়াছে; অর্থাৎ যোগসাধন সম্বন্ধে যাহা কিছু জ্ঞাতব্য প্রায় তৎসমস্তই বর্ণিত হইয়াছে। আর এই যোগসাধন তৃতীয়ভাগে প্রধানতঃ সাধনার কথাই বিবৃত হইয়াছে; অর্থাৎ কেমন করিয়া যোগাভ্যাস করিতে হইবে, প্রত্যূষে শয্যা হইতে উত্থিত হওয়া অবধি রাত্রিতে নিদ্রার সময় পর্য্যন্ত কি কি কার্য্য কিরূপে করিতে হইবে, তাহাই ইহাতে বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু অধুনা দেশ-কাল-পাত্র বিবেচনা করিয়া সাংসারিক সর্ব্বসাধারণের পক্ষেই যাহা সুসাধ্য, তদ্রূপ ব্যবস্থাই ইহাতে সংগৃহীত হইয়াছে। এই ব্যবস্থা অতি সহজ ও সুসাধ্য। অথচ ইহার ফল অপরিসীম! পুস্তকের প্রথম ২৬ পৃষ্ঠাতেই ব্যবস্থার কথা শেষ করা হইয়াছে। পরে জ্ঞানের জন্য, সন্দেহ-ভঞ্জনের জন্য, এবং শ্রদ্ধা-স্থাপনের জন্য ব্যবস্থার শেষে "গুরুশিষ্য-সংবাদ" সংযোজিত হইয়াছে।

পীড়িত ব্যক্তিরা তিনমাস মাত্র দৃঢ়প্রতিজ্ঞাসহকারে এই পথ্যাচার-বিধি পালন করিয়া "ধারণামৃত" সেবন করিলে নিশ্চয়ই রোগমুক্ত হইতে পারিবেন।

সুস্থ ব্যক্তিরা এই পথ্যাচার-বিধি পালন করিয়া মন্ত্রযোগের সাধনা করিলে সাংসারিক অশেষ সুখৈশ্বর্য্য লাভ করিতে পারিবেন। অলম্ বাহুল্যেন।

শ্রী—প্রচারক।

পশ্বাচার-বিধি।

(১) শৌচ, (২) হোম, (৩) মিতাহার, (৪) ধ্যান ও জপ এবং (৫) ব্রহ্মচর্য্য ; প্রধানতঃ এই পঞ্চ আচারকেই পশ্বাচার বলিয়া জানিবে।

(১) শৌচ।

শরীর এবং মন পরিষ্কৃত ও পবিত্র রাখাই শৌচ। শৌচ দ্বিবিধ ; (১) বহিঃশৌচ, এবং (২) অন্তঃশৌচ। জল মৃত্তিকা প্রভৃতি দ্বারা বাহ্য-শরীর নির্ম্মল করাই বহিঃশৌচ, এবং সুচিন্তাপ্রবাহ ও ধ্যান দ্বারা অন্তঃকরণ বিশুদ্ধ রাখাই অন্তঃশৌচ।

বহিঃশৌচ।

১। প্রত্যহ মলত্যাগের পরে যেরূপে শৌচক্রিয়া সাধন কর, তাহাই করিবে। মূত্রত্যাগের পরেও জলশৌচ করিবে।

২। দন্ত ও জিহ্বা পরিষ্কার করিবে।

৩। শরীরের অবস্থা বুঝিয়া বেলা এক প্রহরের মধ্যেই অভ্যঙ্গ স্নান করিবে। শীতকালে ঈষদুষ্ণ জলে এবং গ্রীষ্মকালে শীতল জলে স্নান করিবে। স্নানের সময় উত্তমরূপে গাত্র মার্জ্জনা করিবে। স্নানান্তে আর্দ্রবস্ত্র ত্যাগ করিয়া পরিষ্কৃত শুষ্কবস্ত্র পরিধান করিবে।

৪। দিবসের মধ্যে একবার মাত্র অভ্যঙ্গস্নান করিবে ; কিন্তু প্রত্যেক প্রহরান্তে সর্ব্বদেহ পরিষ্কার করিবে।

৫। অপবিত্র বস্তু দর্শন, স্পর্শন, ঘ্রাণ ও আস্বাদন করিবে না; এবং অপবিত্র ভাষা শ্রবণ বা উচ্চারণ করিবে না।

অন্তঃশৌচ।

১। জপ এবং ধ্যান দ্বারাই অন্তঃশৌচ সমাহিত হইবে; তজ্জন্য অন্যান্য বিধি-বাহুল্যমাত্র।

[বিবৃতি]

সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বেই শয্যাত্যাগ করিবে; এবং জল দ্বারা চক্ষুর্দ্বয় ধৌত করিবে।

মলমূত্রাদি ত্যাগের পরে জলশৌচ করিয়া মৃত্তিকা ও জল দ্বারা হস্ত পরিষ্কার করিবে। প্রস্রাবের পরেও জলশৌচ ক্রিয়া করিবে। এ বিষয়ে আলস্য বা ঔদাস্য করিবে না। শৌচ সম্বন্ধে নিষ্ঠ ব্রাহ্মণগণের রীতি অনুসরণীয় জানিবে।

দন্ত-মঞ্জন (দাঁতের মাজন) দ্বারাই দন্ত পরিষ্কার করিবে। দন্তকাষ্ঠ (দাতন) ব্যবহার করিবে না। জিহ্বা-মার্জ্জনী (জিভছোলা) দ্বারা জিহ্বার ক্লেদ পরিষ্কার করিবে।

(দন্ত-মঞ্জন)

ফুলখড়িচূর্ণ এক ছটাক (৫ তোলা), সুপারিচূর্ণ * এক ছটাক, লবণ এক ছটাক, ফটকিরিচূর্ণ আধ ছটাক, শুঁঠ ও মরিচ চূর্ণ আধ ছটাক, কর্পূর দশ রতি, এই সমস্ত একত্রে উত্তমরূপে মিশ্রিত ও পেষণ করিয়া লইলেই উৎকৃষ্ট দন্ত-মঞ্জন প্রস্তুত হয়। ইহা দন্তের অত্যন্ত হিতকর এবং মুখের

---

* সুপারি হাঁড়িতে বা কড়ায় ঈষৎ ভাজিয়া অর্থাৎ ঝল্‌সাইয়া চূর্ণ করিবে, সাক্ষাৎসম্বন্ধে আগুনে পোড়াইবে না।

ক্লেদ ও দুর্গন্ধনাশক। এতদ্দারাই প্রত্যহ দন্ত পরিষ্কার করিবে।

প্রত্যহ বেলা এক প্রহরের মধ্যে অর্থাৎ বেলা ৯ টার মধ্যেই স্নান করা অত্যন্ত হিতকর জানিবে।

অগ্রে সর্ব্বশরীরে উত্তম সার্ষপতৈল (সরিষার তেল) উত্তমরূপে মর্দ্দন করিয়া স্নান করিতে হইবে। নাসিকা, কর্ণ ও নাভিকুণ্ডের মধ্যেও তৈল দিবে।

যদি সর্দ্দি অর্থাৎ শ্লেষ্মাধিক্য না থাকে এবং শরীর ভার-বোধ না হয়, তবে শীতল জলে অবগাহন-স্নানই প্রশস্ত। কিন্তু শীতকালে ঈষৎ উষ্ণ (যাহা শরীরের পক্ষে সুখস্পর্শ এরূপ) জল দ্বারাই স্নান করিবে।

স্নানের সময় গাত্রমার্জ্জনা (গামোছা) দ্বারা সর্ব্বশরীর উত্তমরূপে মার্জ্জন করিবে। পরে আর্দ্র বস্ত্রত্যাগ করিয়া পরিষ্কৃত শুষ্ক বস্ত্র পরিধান করিবে। পট্টবস্ত্র অর্থাৎ রেশমী কাপড় প্রশস্ত জানিবে। তদভাবে শুক্ল কার্পাস বস্ত্র ব্যবহার করিবে।

প্রত্যহ একবারমাত্র অভ্যঙ্গস্নান অর্থাৎ সর্ব্বশরীরে তৈল-মর্দ্দন করিয়া স্নান করা বিহিত। যদি জ্বর ও সর্দ্দি থাকে তবে অবগাহন-স্নান করিবে না। কিন্তু তৈল মাখিয়া উষ্ণ জল দ্বারা গাত্র পরিষ্কার করিবে।

পরে এক প্রহর অর্থাৎ ৩ ঘণ্টা অন্তর এক এক বার সর্ব্ব-শরীর ভিজা গামছা দ্বারা মাজিয়া পুনরায় শুষ্ক বস্ত্র দ্বারা গা মুছিয়া ফেলিবে। বেলা ১২টা, ৩টা ও ৬টা এবং রাত্রি ৯টার সময় এইরূপে প্রত্যহ গাত্র পরিষ্কার করিবে।

অপবিত্র বস্তু দর্শন করিলে এবং অপবিত্র ভাষা শ্রবণ করিলে অন্তঃশৌচের ব্যাঘাত হয়। আর অপবিত্র বস্তু স্পর্শন, ঘ্রাণ ও আস্বাদন করিলে বহিঃশৌচ ও অন্তঃশৌচ উভয়তঃ হানি হয়। অতএব যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়া শৌচ রক্ষা করিবে। তজ্জন্যই নিম্নলিখিত বিষয়গুলির প্রতি যত্নবান্ হইবে যথা ;—

(১) ভক্তিভাজন গুরুজন ব্যতীত অন্যের মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিবে না। দৃষ্টি সর্ব্বদা অধোনত করিয়া রাখিবে অথবা পবিত্র বস্তু সর্ব্বদা নিরীক্ষণ করিবে। ধাতুদ্রব্য, পত্র, পুষ্প, জল, গো, আকাশ, সূর্য্য, চন্দ্র, নক্ষত্র, দৈবমূর্ত্তি বা দেবতার ছবি প্রভৃতি পবিত্র দৃশ্য। গুরুজনব্যতীত অন্যের সহিত বাক্যালাপ করিবার সময়ও তাহার চক্ষুর দিকে দৃষ্টিপাত করিবে না।

(২) কাহারও সহিত একাসনে বসিবে না। অর্থাৎ সংস্পর্শ বা সঙ্গদোষ যথাসাধ্য পরিত্যাগ করিবে।

যেমন সুরভি পুষ্প হইতে নিয়ত সৌরভ নিঃসৃত হয় এবং যেমন মৃতদেহ হইতে নিয়ত পূতিগন্ধ নিঃসৃত হয়, তদ্রূপ প্রত্যেক ব্যক্তি হইতেই নিয়ত দুর্গন্ধ নিঃসৃত হইতেছে, ইহা স্মরণ রাখিবে। অতএব যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়া জনসঙ্গ ত্যাগ করিবে।

(৩) নিতান্ত কার্য্যপ্রয়োজন ব্যতীত অন্য সময় গৃহমধ্যে থাকিবে না। নির্ম্মল বায়ুসঞ্চালিত অনাবৃত স্থানেই দিবসের অধিকাংশ সময় অতিবাহিত করিতে চেষ্টা করিবে। অনাবৃত উচ্চ স্থান, (ছাদ, পাহাড়, পর্ব্বত) বন, উপবন,

ময়দান, উদ্যান, এবং প্রশস্ত নদী বা সরোবরতীরে একাকী জপসাধন করিবে। রাত্রিতে হোমগৃহেই (শয়নগৃহেই) জপসাধন করিবে।

(৪) বাক্‌সংযম ও শ্রুতিসংযম অভ্যাস করিবে অর্থাৎ পাপকথা শ্রবণ করিবে না। নিতান্ত প্রয়োজন ব্যতীত কাহারও সহিত বাক্যালাপ করিবে না। কেহ কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলেই অগ্রে মনে চিন্তা করিবে, কি কি কথা বলা নিতান্ত আবশ্যক; পরে কথা বলিবে। ফলতঃ অতি-রিক্ত বাক্যব্যয় করিবে না এবং অনাবশ্যক কথা শুনিতে ইচ্ছা করিবে না। ফলতঃ যথাসাধ্য বাক্‌সংযম অভ্যাস করিবে। বাক্‌সংযম অন্তঃশৌচসাধনের প্রকৃষ্ট উপায় জানিবে। জপ ও ধ্যানের জন্য বাক্‌সংযম ও সঙ্গত্যাগ নিতান্ত আবশ্যক। আর জপ এবং ধ্যানই অন্তঃশৌচসাধনের প্রকৃষ্ট উপায়। অন্তঃশৌচসাধনের অন্যান্য উপায় আছে; কিন্তু সে সকল তোমার পক্ষে বাহুল্য বলিয়া অনাবশ্যক। যেহেতু তোমার বাহুল্য কার্য্যের অবসর নাই।

(২) হোম।

১। স্নানের পূর্ব্বেই অষ্টোত্তর শতসংখ্যক বিল্বপত্র সংগ্রহ করিবে।

২। স্নানের পরে পট্টবস্ত্র অথবা বিশুদ্ধ কার্পাস বস্ত্র পরিধান করিবে এবং ললাটে, বক্ষঃস্থলে ও বাহুযুগলে চন্দন লেপন করিবে।

৩। অনন্তর শয়ন-গৃহে ঘৃত-প্রদীপ জ্বালিবে এবং ধূপধুনা পোড়াইবে। তদনন্তর অগ্নিকুণ্ড প্রজ্বালিত করিয়া শুদ্ধাসনে উপবেশন পূর্ব্বক প্রার্থনাসহকারে মন্ত্রজপ করিতে করিতে ঘৃতসিক্ত বিল্বপত্র এক একটী করিয়া সেই অগ্নিতে আহুতি প্রদান করিবে।

[বিবৃতি]

স্নানের পূর্ব্বেই একশত আটটী (১০৮) বিল্বপত্র সংগ্রহ করিবে। গ্রামান্তর হইতে অর্থাৎ স্বীয় বাসভবন হইতে অন্যূন সহস্র ধনু (অর্দ্ধক্রোশ) অন্তরস্থ স্থান হইতে বিল্বপত্র সংগ্রহ করাই প্রশস্ত ; কিন্তু কোনরূপ বিশেষ প্রতিবন্ধক থাকিলে স্বগ্রাম বা স্বভবনস্থ বৃক্ষ হইতেই বিল্বপত্র চয়ন করিবে। এই বিল্বপত্রগুলি স্বয়ং সংগ্রহ করিবে ; অন্যকে স্পর্শ করিতে দিবে না। বিল্বপত্রগুলিতে যেন জীবন্ত কীট (পিপীলিকা, মাকড়সা প্রভৃতি) না থাকে। অর্থাৎ পরিষ্কার করিয়া লইবে।

হোমের জন্য একখানি স্বতন্ত্র গৃহ অর্থাৎ যে গৃহে অন্যের যাতায়াতের প্রয়োজন নাই, এরূপ গৃহ হইলেই ভাল হয়। কিন্তু স্বয়ং সেই গৃহে রাত্রিকালে শয়ন করিবে।

হোমের জন্য কাষ্ঠ (যে কোন কাষ্ঠ বা ঘুঁটে), একশত আটটী বিল্বপত্র, গব্যঘৃত (অভাবে মাহিষ ঘৃত), ধূপধূনা, ঘৃত-প্রদীপ, চন্দন (শ্বেত বা রক্ত), এবং কুশাসন (অথবা অন্যরূপ আসন) আবশ্যক।

স্নানের পরে বিশুদ্ধ বস্ত্র পরিধান করিয়া শরীরে চন্দন

লেপন করিবে। এবং বিল্বপত্রগুলিও ঘৃতসিক্ত করিয়া লইবে। পরে শয়নগৃহে ঘৃতপ্রদীপ ও ধূপধুনা জ্বালাইয়া কাষ্ঠগুলি চতুরস্রভাবে সজ্জিত করিয়া তাহাও জ্বালাইবে।

অনন্তর কুশাসনে বা অন্যবিধ পবিত্র আসনে উপবেশন করিয়া চিত্ত স্থির করতঃ চক্ষু মুদ্রিত করিয়া এইরূপ চিন্তা করিবে যথা ;—

"এই গৃহ হইতে ভূতপ্রেত, পিশাচ ও যক্ষরাক্ষসাদি অনিষ্টকর দেবযোনি সকল পলায়ন করিয়াছে ; এক্ষণে আমার এই ক্ষুদ্র কুটীর মহাত্মা দেবগণ কর্ত্তৃক পূর্ণ হইয়াছে। এখানে ইন্দ্রাদি স্বর্গীয় দেবগণ উপস্থিত হইয়াছেন। আমার এই ক্ষুদ্র কুটীরে বিষ্ণুলোক, ব্রহ্মলোক ও শিবলোক হইতেও দেবগণ আবির্ভূত হইয়াছেন। আহা, অদ্য আমার কি সৌভাগ্য উপস্থিত!" এইরূপ চিন্তা করিতে করিতেই দেখিবে শরীর রোমাঞ্চিত, প্রাণ পুলকিত এবং ভক্তিভরে কণ্ঠ রুদ্ধপ্রায় হইবে।*

তখন উপস্থিত দেবগণের নিকট তোমার আন্তরিক প্রার্থনা জানাইবে এবং মন্ত্রজপ করিতে করিতে অগ্নিতে ঘৃতসিক্ত বিল্বপত্র এক একটী করিয়া প্রক্ষেপ করিবে। বিল্বপত্রগুলি নিঃশেষিত হইলে দেবগণের নিকট পুনরায় প্রার্থনা করিয়া হোম সমাপ্ত করিবে।

---

* যদি এরূপ রোমাঞ্চ ও আনন্দ না জন্মে এবং ভক্তির উদয় না হয়, তবে জানিবে হোমগৃহে কোন অপবিত্র বস্তু আছে ; অথবা তোমার শৌচ সম্বন্ধে কোন প্রকার গুরুতর দোষ ঘটিয়াছে, তাহা হইলে তৎপ্রতিকারে তৎক্ষণাৎ যত্নবান্ হইবে।

যে আসনে বসিয়া হোম করিবে, তাহা যত্নপূর্ব্বক তুলিয়া রাখিবে; অন্য কেহ যেন সেই আসন স্পর্শ না করে, অন্যে স্পর্শ করিলে সেই আসন পরিত্যাগ করিয়া নূতন আসন গ্রহণ করিবে।

পরদিন প্রত্যূষে হোমীয় ভস্মাদি স্থানান্তরিত করিয়া গৃহটী উত্তমরূপে পরিষ্কৃত করিবে। গৃহের কোন স্থানে যেন দুর্গন্ধ ও অপবিত্র দ্রব্য বা ময়লা না থাকে।

হোমীয় দ্রব্যাদির সংগ্রহ এবং হোম-গৃহ পরিষ্করণ প্রভৃতি স্বয়ং করিবে; অন্যের প্রতি ভারার্পণ করিবে না।

হোম-গৃহে চর্ম্মপাদুকা ব্যবহার করিবে না; কিন্তু কাষ্ঠ-পাদুকা (খড়ম) ব্যবহার করিবে; যেহেতু রিক্তপদে কোথায়ও পাদচারণ করা কর্ত্তব্য নহে। অন্যত্র চর্ম্মপাদুকা ও ছত্র ব্যবহার করিবে। ফলতঃ যাহাতে শরীরের অনর্থক ক্লেশ হয়, তাহা করিবে না।

অন্যের ব্যবহৃত বস্ত্র, গাত্রমার্জ্জনী, ও পাদুকা ব্যবহার করিবে না।

(৩) আহার-শুদ্ধি।

১। লোভ এবং কুচিন্তা বর্জ্জন করিবে।

২। সাত্ত্বিক খাদ্য দ্বারা পাকস্থলীর অর্দ্ধেক এবং বিশুদ্ধ পানীয় দ্বারা পাদাংশ পূরণ করিবে। অবশিষ্ট পাদাংশ বায়ু-সঞ্চালনের জন্য শূন্য রাখিবে। ফলতঃ আকাঙ্ক্ষা থাকিতেই ভোজন সমাপ্তি করিবে।

৩। একাদশী, অমাবস্যা ও পূর্ণিমা তিথিতে রাত্রিতে ভোজন করিবে না।

৪। মৎস্যমাংসাদি তামসিক খাদ্য ভোজন করিবে না এবং মাদক-দ্রব্য সেবন করিবে না।

[বিবৃতি]

শরীরের জন্য এবং মনের জন্য যাহা গ্রহণ করা যায়, তাহার নাম আহার। শরীরের জন্য খাদ্য এবং মনের জন্য বিষয় (অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু সম্বন্ধীয় চিন্তা) গ্রহণ করা যায়। অতএব আহারশুদ্ধি বলিলে সাত্ত্বিক খাদ্য এবং সাত্ত্বিক চিন্তা বুঝিবে। এই উভয়বিধ আহার পরস্পর সাপেক্ষ; অর্থাৎ সাত্ত্বিক খাদ্য গ্রহণ না করিলে সাত্ত্বিক চিন্তারও সম্ভাবনা নাই এবং সাত্ত্বিক চিন্তার অভাবেও সাত্ত্বিক খাদ্য গ্রহণে রুচির সম্ভাবনা নাই। সাত্ত্বিক আহারই যাবতীয় সংসার-দুঃখ-দূরীকরণের একমাত্র উপায়। অতএব আহার-শুদ্ধি বিষয়ে বিশেষ যত্ন আবশ্যক, লোভ এবং কুচিন্তা বর্জ্জন না করিলে আহার-শুদ্ধির সম্ভাবনা নাই; তজ্জন্য প্রথমেই লোভ ও কুচিন্তা বর্জ্জন করিতে বলা হইয়াছে।

শরীরের পুষ্টি, বল, ও আরোগ্যের জন্যই খাদ্য গ্রহণ আবশ্যক; ফলতঃ জিহ্বার ক্ষণিক তৃপ্তি আহারের উদ্দেশ্য নহে, এই কথা স্মরণ রাখিলে লোভ সহজে ত্যাগ করা যায়।

যে সকল খাদ্য আয়ুঃ, সত্ত্বগুণ, বল, আরোগ্য, সুখ এবং প্রীতি বর্দ্ধন করে, সেই সকল খাদ্যই সাত্ত্বিক। যথা ঘৃত, দুগ্ধ, শর্করা প্রভৃতি।

অতি-কটু, অত্যম্ল, অতি-লবণ, অত্যুষ্ণ, অতি-তীক্ষ্ণ, অতি-রুক্ষ প্রভৃতি খাদ্য রাজসিক। এবং শীতলাবস্থাপ্রাপ্ত (বাসী);

রসহীন (শুষ্ক), দুর্গন্ধ, পূর্ব্বদিনপক্ক (পচা, পান্তা), উচ্ছিষ্ট (অন্যের ভুক্তাবশিষ্ট), প্রভৃতি অপবিত্র খাদ্যই তামসিক। যথা, মৎস্য, মাংস, ডিম্ব, মাদক-দ্রব্য, পিঁয়াজ, রসুন, প্রভৃতি।

মিতাহার।

সাত্ত্বিক খাদ্যই আহার করিবে। কিন্তু সাত্ত্বিক খাদ্যও অধিক পরিমাণে গ্রহণ করিবে না। কেননা, ক্ষুধানিবৃত্তির জন্য যে পরিমাণ খাদ্য আবশ্যক, তাহার অতিরিক্ত পরিমাণ খাদ্য গ্রহণ করিলেই অনিষ্ট হইবে; সুতরাং তাহা হইলে সাত্ত্বিক খাদ্যও রাজসিক ও তামসিক খাদ্যের ন্যায় কুফল-জনক হইবে। এই জন্য মিতাহার কর্ত্তব্য। এবং মিতাহারের জন্য আহার-সময়ে বিশেষ সতর্ক থাকা আবশ্যক। সেই জন্যই "আকাঙ্ক্ষা থাকিতেই ভোজন সমাপ্তি করিবে।" অর্থাৎ আরও কিছু খাইলেও খাইতে পারি, কিন্তু আর খাইলে উদরের পাদাংশ (চতুর্থাংশ) খালি থাকিবে না, পূর্ণ হইয়া যাইবে; অতএব আর খাইব না, এইরূপ মনে করিয়াই ভোজন-ক্রিয়া শেষ করিবে। মোহান্ধ মানবগণ আহারের উদ্দেশ্য বিস্মৃত হইয়া রসনার ক্ষণিক তৃপ্তিসাধন করিবার জন্য অসংখ্য দ্রব্যের স্বাদগ্রহণে লোলুপ হয়, সেই জন্যই জগতে মনুষ্যের অখাদ্য প্রায় কিছুই দেখা যায় না। এবং তজ্জন্যই জগতে অসংখ্য রোগেরও প্রাদুর্ভাব দেখা যায়। যাহা হউক, তুমি তামসিক ও রাজসিক খাদ্য কখনও আহার করিবে না; এবং সাত্ত্বিক খাদ্যের মধ্যেও অত্যল্প নির্দ্দিষ্ট সংখ্যা আহার্য্য বলিয়া স্থির করিবে। নিতান্ত অভাবগ্রস্ত না হইলে সেই

নির্দ্দিষ্ট সীমা অতিক্রম করিবে না। উদাহরণ দ্বারা এই বিষয়টী বুঝাইতেছি শুন ;—

পূর্ব্বাহ্নিক জলখাবার।

হোমের পরে এবং মধ্যাহ্ন-ভোজনের পূর্ব্বে কিছু ছোলা-ভিজা, আদার কুচি ও লবণ একত্র মিশ্রিত করিয়া খাইবে এবং দুই চারিখানি বাতাসা বা একটু চিনি কিংবা মিশ্রি খাইয়া জল পান করিবে। অন্য কোন প্রকার জলখাবার খাইবে না।

ঔষধ-সেবন।

উল্লিখিতরূপ জলখাবার খাইবার অন্যূন আধ ঘণ্টা পরে আধ পোয়া ঈষৎ উষ্ণ দুগ্ধের সহিত মিশ্রিত করিয়া "ধারণামৃত" সেবন করিবে।

মধ্যাহ্ন-ভোজন।

ঔষধ-সেবনের অন্যূন আধ ঘণ্টা পরে মধ্যাহ্নভোজন করিবে।

এই বঙ্গদেশে ন্যূনাধিক এক পোয়া তণ্ডুলের অন্ন উদরস্থ করিলেই মধ্যাহ্নভোজনের প্রয়োজন সম্পন্ন হয়। কেবল ঘৃত এবং দুগ্ধ দ্বারাই এই এক পোয়া তণ্ডুলের অন্ন উদরস্থ করা যাইতে পারে, ঘৃতের সহিত একটু লবণ এবং দুগ্ধের সহিত একটু চিনি বা মিশ্রি কিংবা কয়েকখানি বাতাসা মিশ্রিত করিলেই হইতে পারে।

কিন্তু প্রত্যহ কেবল ঘৃত ও দুগ্ধ দিয়া অন্ন ভোজন করিলে

চিরাভ্যাসবশতঃ আহারে অরুচি জন্মিতে পারে; তজ্জন্য ঘৃত দুগ্ধ ব্যতীতও অন্যান্য খাদ্যের প্রয়োজন হইবে। অতএব অন্নের সহিত আলু পটোল বা আলু বেগুণ কিংবা হেলেঞ্চা শাক সিদ্ধ করিয়া লইয়া তাহাতে ঘৃত ও লবণ মিশ্রিত করিয়া ভোজন করিতে পার।

মুগ, মুসুরি, কালী কলাই বা ছোলার দাউল রন্থই করিয়াও অন্নের সহিত ভোজন করিতে পার।

কাগচি বা পাতিনেবুর রস চিনি মিশ্রিত করিয়াও অন্নের সহিত ভোজন করিতে পার।

শরৎকালে (আশ্বিন কার্ত্তিক অগ্রহায়ণ মাসে) পল্‌তার শুক্ত বা ডাল্‌না এবং বসন্তকালে (ফাল্গুন চৈত্র বৈশাখ মাসে) নিম্‌শুক্ত বা নিম্‌বেগুণ ভাজা আহার করিতে পার। কিন্তু ব্যঞ্জনে তৈল ব্যবহার করিবে না; ঘৃতই ব্যবহার করিবে।

অতএব সাত্ত্বিক আহার্য্য দ্রব্যগুলি নির্দ্দিষ্ট হইল যথা;—

তণ্ডুলের অন্ন, আটা বা সুজির রুটি, ঘৃত, দুগ্ধ, দাউল (মুগ, মুসুরি, ছোলা, কলাই), তরকারি ও শাক (আলু, পটোল, বেগুণ প্রভৃতি এবং হেলেঞ্চা, পল্‌তা ও নিম্‌পাতা), লেবু (কাগচি, পাতি), লবণ, চিনি বা বাতাসা বা মিশ্রি। এই সীমার মধ্যেই আহার্য্য নির্ব্বাচন করিবে; নিতান্ত অভাবে না পড়িলে সীমার বাহিরে যাইবে না। কিন্তু প্রাণান্তেও রাজসিক ও তামসিক খাদ্য আহার করিবে না। আহার সম্বন্ধে যথাসাধ্য যতই ত্যাগ করিবে, ততই মঙ্গল জানিবে।

দেশের দুর্ভাগ্যবশতঃ অধুনা ঘৃত-দুগ্ধের অভাব হইয়াছে এবং তজ্জন্য ঘৃতদুগ্ধ দুর্লভ হইয়াছে। সুতরাং এরূপ স্থানে

যদি তোমার সাংসারিক অবস্থা সচ্ছল না হয়, তাহা হইলে, তুমি মনে করিতে পার যে "আমি গরীব লোক, ঘৃত দুগ্ধ ভোজন আমার অসাধ্য" কিন্তু এরূপ মনে করিও না, কেন না রাজসিক ও তামসিক সমস্ত ভোজ্য পরিহার করিলে তোমার যে খরচ বাঁচিয়া যাইবে, তদ্দ্বারা তুমি অক্লেশেই ঘৃত-দুগ্ধ ভোজন করিতে পারিবে। সাত্ত্বিক খাদ্যের মধ্যে ঘৃতদুগ্ধই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। অতএব ঘৃত দুগ্ধ নবনীত ভোজন করিতে যত্নশীল হইবে। [দধি, তক্র (ঘোল) ও ছানা আহার করিবে না।]

অভ্যাস-অনুসারে আতপ বা সিদ্ধ তণ্ডুলের অন্ন আহার করিবে। এ সম্বন্ধে অভ্যাস পরিবর্ত্তনের আবশ্যকতা নাই অর্থাৎ যদি তোমার সিদ্ধ তণ্ডুলের অন্ন ভোজন করাই চিরাভ্যস্ত হয়, তবে সিদ্ধ তণ্ডুলের অন্নই ভোজন করিবে, আতপতণ্ডুলের অন্ন ভোজন করিবে না। কেননা তাহাতে শরীর অসুস্থ হইবার সম্ভাবনা। কিন্তু আতপ তণ্ডুলের অন্ন ভোজন করিলে যদি (কোষ্ঠবদ্ধপ্রভৃতি কারণে) শরীরের গ্লানি না জন্মে, তবে আতপ তণ্ডুলের অন্নই প্রশস্ত জানিবে।

ঘৃতের মধ্যে গব্য ঘৃতই প্রশস্ত, কিন্তু অভাবে মাহিষ ঘৃতই ব্যবহার করিবে।

পুরাতন তণ্ডুলের অন্নই প্রশস্ত; কিন্তু পুরাতন তণ্ডুল যদি কীটজীর্ণ (পোকা লাগিয়া ছিদ্রবিশিষ্ট) হয় অথবা বিস্বাদ বা অম্লরস হয়, তবে তাহা ব্যবহার করিবে না, তৎপরিবর্ত্তে নূতন তণ্ডুলের অন্নই ব্যবহার করিবে। ফলতঃ অন্ন রুচিকর হওয়া আবশ্যক। তজ্জন্য সাগু, এরারুট

প্রভৃতি বিস্বাদ খাদ্য (লঘুপাক হইলেও) ব্যবহার করিবে না। প্রত্যুত প্রীতিকর খাদ্যই ভোজন করিবে, তবে "আকাঙ্ক্ষা থাকিতে ভোজন সমাপ্তি করিবে" এই মহামূল্য আদেশ স্মরণ রাখিবে।

একাদশীর দিন তণ্ডুলের অন্নের পরিবর্ত্তে সুজি বা আটার রুটি আহার করিবে। যদি অসুবিধা না হয় তবে ষষ্ঠী, একাদশী, অমাবস্যা ও পূর্ণিমা এই কয় তিথিতেই অন্নের পরিবর্ত্তে রুটি ব্যবহার করিলে ভাল হয়, অর্থাৎ ৪।৫ দিন অন্তর অন্নের পরিবর্ত্তে রুটি ব্যবহার করিতে পার। করিলে শরীরের পক্ষে বিশেষ উপকার হইবে, কিন্তু না করিলেও বিশেষ অপকার হইবে না।

পানীয় (জল)।

স্রোতস্বতী নদীর পরিষ্কৃত জল পান করাই উচিত। তদভাবে প্রশস্ত সারোবরে পরিষ্কৃত জল পান করিবে। তাহার অভাব হইলে সামান্য পুষ্করিণীর জল উত্তমরূপে সিদ্ধ করিয়া লইবে এবং শীতল অবস্থায় সাবধানে ছাঁকিয়া লইয়া পান করিবে। অথবা বালকপাঠ্য পুস্তকে অবিশুদ্ধ জল যেরূপে চারিটী কলসী দ্বারা কয়লা ও বালির মধ্যে ছাঁকিয়া লইবার বিধান আছে, সেইরূপেই জল বিশোধিত করিয়া লইবে। কিন্তু তদ্রূপে জল বিশোধিত করিবার পূর্ব্বেও জল সিদ্ধ করিয়া লইবে।

যদি পানীয় জল দূষিত মনে কর, তবে উষ্ণ দুগ্ধ এবং ডাব নারিকেলের জল যথেষ্ট পান করিয়া তৃষ্ণা নিবারণ করিবে।

মুখশোধন।

ভোজনান্তে শৌচক্রিয়ার (আচমনের) পরে মুখশোধনের প্রয়োজন। কিন্তু পাণ-সুপারি-খয়ের-চুণ মুখে দিবে না।

ধনে, মৌরি, লবঙ্গ, ছোট ও বড় এলাইচের দানা এবং দারুচিনি, এইগুলি একত্র করিয়া একটী কৌটায় বা শিশিতে রাখিবে। ভোজনান্তে মুখশোধনের জন্য সেই মশলা, কিঞ্চিৎ ব্যবহার করিবে; ভোজনান্তে মুখশোধন না করিলে মুখে দুর্গন্ধ হইবার সম্ভাবনা। এই মুখশোধন মসলা-গুলি পরিপাক-ক্রিয়ার সহায়তা করিবে এবং মুখের দুর্গন্ধ নষ্ট করিবে।

অপরাহ্নের জলখাবার।

অপরাহ্নে অর্থাৎ বেলা ৪।৫ টার সময় ক্ষুধার উদ্রেক হইলে কিছু জলখাবার আবশ্যক হয়। এই জলখাবার জন্য ফল মূলই যথেষ্ট; যথা—নারিকেল, বেল, আম্র, কদলি, পেঁপে, কমলা লেবু, কালজাম, সুপক্ক পেয়ারা, সুমিষ্ট নিচু, ইক্ষু, শাঁক আলু, এবং দুগ্ধ, নবনীত ও শর্করা এই নির্দ্দিষ্ট সীমার মধ্য হইতেই নির্ব্বাচন করিবে। এতদ্ব্যতীত অন্য বিধ খাদ্য গ্রহণ করিবে না। অর্থাৎ তরমুজ, শসা, কাঁঠাল, ফুটি, কুল, প্রভৃতি ফল না খাওয়াই ভাল, এবং দধি, তক্র, ছানা, সন্দেশ, রসগোল্লা, লুচি, কচুরি, মিঠাই প্রভৃতি ভক্ষণ করিবে না।

পুনঃ মুড়ি, চাল কলাই ভাজা প্রভৃতি শুষ্ক দ্রব্য ভক্ষণ করিবে না।

নারিকেলের শস্য চিনি মিশ্রিত করিয়া ভক্ষণ করিবে এবং নারিকেলের জল যথেষ্ট পান করিবে। একমাত্র এই নারিকেল দ্বারাই অপরাহ্নের জল খাবার পর্য্যাপ্ত হইতে পারে, অভাব পক্ষেই অন্যান্য ফলের উল্লেখ করা হইয়াছে জানিবে।

রাত্রিকালীন ভোজন।

রাত্রি ৮।৯ টার সময় ক্ষুধার উদ্রেক হইলে কিছু ভোজন করা আবশ্যক। (ক্ষুধার উদ্রেক না হইলে ভোজন করা অনাবশ্যক একথা বলাই বাহুল্য)।

অতএব রাত্রিতে দুধভাত বা দুধ রুটী অল্প চিনি মিশাইয়া ভোজন করিবে। অন্য কিছু ভোজন করিবে না। যদি দুগ্ধের নিতান্ত অভাব হয়, তবে মধ্যাহ্ন-ভোজনের নির্দ্দিষ্ট আহার্য্য সামগ্রী হইতে নির্ব্বাচন করিবে, কিন্তু রাত্রিকালীন ভোজন অর্দ্ধাশন হওয়া আবশ্যক অর্থাৎ রাত্রিতে ক্ষুধা থাকিতেই ভোজন সমাপ্তি করিবে। রাত্রিতে কদাপি যেন পরিতৃপ্তি সহকারে আহার করিও না।

একাদশী, অমাবস্যা ও পূর্ণিমা এই তিন তিথিতে রাত্রিতে কিছুমাত্র আহার করিবে না। অপরাহ্নের জলখাবার দ্বারাই দিবসীয় ভোজন-ব্যাপার সমাপ্ত করিবে।

আহারসম্বন্ধীয় অন্যান্য নিয়ম।

খাদ্যদ্রব্যাদি স্বয়ং আহরণ করিয়া এবং স্বয়ং পাক করিয়া আহার করাই প্রশস্ত। কিন্তু অধুনা এই নিয়ম সকলের পক্ষে সুসাধ্য নহে। যাহাহউক স্বপাক ভোজন

অখাদ্য না হইলেও অশুচি দ্রব্য আহার করিবে না। শুদ্ধাচারসম্পন্ন গুরুজনের হস্তে আহার্য্য গ্রহণ করিতে পার।

হোটেলে ভোজন করিবে না।

কোন স্থানে নিমন্ত্রণে গিয়া কিছুমাত্র ভোজন করিবে না। ফলতঃ খাওয়া দূরে থাক্, বহুলোকের সমাগম-স্থানে যাওয়াও তোমার পক্ষে অনুচিত জানিবে। তবে সাংসারিক কার্য্যের অনুরোধে যদি তদ্রূপ স্থলে যাওয়া নিতান্ত আবশ্যক হয়, তাহা হইলে যাইবে; কিন্তু তদ্রূপ স্থানে কিছুমাত্র আহার করিবে না।

মাদক।

মদ, গাঁজা, আফিম্, সিদ্ধি, তামাক, চুরট, চা, কাফি, প্রভৃতি মাদক দ্রব্য সেবন করিবে না।

আহারান্তে বিশ্রাম।

ভোজনান্তে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিয়া তদনন্তর সাংসারিক প্রয়োজনীয় কার্য্যাদি সম্পন্ন করিবে।

সাংসারিক কার্য্য।

সাংসারিক কার্য্য সম্পাদনের জন্য অন্যান্য ব্যক্তির সংস্রব আবশ্যক বটে, কিন্তু সেই সংস্রব যত কমাইতে পার, তদ্বিষয়ে চেষ্টা করিবে। এবং নিম্নলিখিত বিধানগুলি স্মরণ রাখিবে। যথা;—

(১) কোনরূপে কাহারও অন্তঃকরণে বেদনা দিও না।

(২) মিথ্যা কথা বলিও না।

(৩) যথাসাধ্য মৌন অবলম্বন করিবে। কিন্তু কথা না কহিলেও সহাস্যভাব রক্ষা করিবে।

(৪) পরদ্রব্য অপহরণ করিও না।

(৫) স্বীয় অবস্থায় সর্ব্বদা সন্তুষ্ট থাকিবে।

মনের সন্তোষ বিধান জন্য,—

(ক) সর্ব্বজগতের কল্যাণ কামনা করিবে; জগতের সকলকেই আত্মীয় মনে করিবে। কাহারও সমৃদ্ধি বা সুখ দেখিলেই আনন্দিত হইবে।

(খ) কাহারও দুঃখ দেখিলে করুণার্দ্র হইবে।

(গ) কাহাকেও পুণ্যকার্য্য করিতে দেখিলে হর্ষ প্রকাশ করিবে।

(ঘ) কাহাকেও পাপকার্য্য করিতে দেখিলে উপেক্ষা করিবে অর্থাৎ দেখিয়াও দেখিবে না, শুনিয়াও শুনিবে না, তদ্বিষয়ে চিন্তাও করিবে না।

(৬) স্বীয় মৃত্যুর কথা নিয়ত স্মরণ রাখিয়া ধৈর্য্য বা সহিষ্ণুতা অবলম্বন করিবে। অপকারীর অপকার করিতে চেষ্টা করিবে না।

দেবগণ সতত তোমার রক্ষাবিধান করিতেছেন, কেহই তোমার অপকার করিতে সমর্থ নহে; এই বিশ্বাস হৃদয়ে নিহিত রাখিবে। যাহা আপাততঃ তোমার অপকার বলিয়া বোধ হইবে, পরে তাহাই তোমার পরম ইষ্টসাধক হইবে, ইহাতে দৃঢ়বিশ্বাস করিবে। অতএব দেবগণের আশ্রয় ত্যাগ করিয়া যেন সয়তানের বশীভূত হইও না, অর্থাৎ সহিষ্ণুতা পরিত্যাগ করিয়া ক্রোধের বশীভূত হইও না।

(৭) যদি তুমি অন্যের চাকর অর্থাৎ ভৃত্য হও, তবে প্রভুর কার্য্যকে স্বীয় কার্য্য মনে করিয়া সর্ব্বান্তঃকরণে তাহা সুসম্পন্ন করিতে চেষ্টা করিবে। এবং আপনাকে সর্ব্বদা সৌভাগ্যবান্ মনে করিবে। যে ধর্ম্মসাধনের ইচ্ছা করে, সে যে কোন অবস্থায় থাকুক্ না কেন, সেই অবস্থাতেই ধর্ম্মসাধন করিতে পারে।

এই সংসার অনিত্য; এখানে কামনার বস্তু কিছুই নাই; সুতরাং নিষ্কাম বা উদাসীনভাবেই স্বীয় জড়দেহকে যন্ত্রের ন্যায় পরিচালিত করিবে। বাগানের মালী যেমন প্রভুর জন্যই বৃক্ষের ফলাদির রক্ষা করে, এবং স্বয়ং স্বল্পে সন্তুষ্ট থাকে, তুমিও তদ্রূপ এই সংসার-উদ্যানে আপনাকে ভগবানের মালী মনে করিয়া স্বল্পে সন্তুষ্ট থাকিবে।

ফলতঃ সাংসারিক কার্য্যে কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ ও মাৎসর্য্য এই ষড়রিপুর দমন করিবে। সর্ব্বদা এই কুপ্রবৃত্তিগুলির প্রতি সতর্ক মানসদৃষ্টি রাখিবে। এই সকল কুপ্রবৃত্তির অধীন হইলেই উন্নত দেবতারা তোমাকে পরিত্যাগ করিবেন এবং তখন সয়তানগণ অর্থাৎ ভূত প্রেত পিশাচাদি নিকৃষ্ট দেবযোনি সকল তোমাকে বশীভূত করিয়া নরক যন্ত্রণা প্রদান করিবে; এই কথা নিয়ত স্মরণ রাখিবে।

(৪) জপ ও ধ্যান।

১। দিবসীয় কার্য্যের অবসানে কিছুক্ষণ আত্মচিন্তা ও নিত্যানিত্য বিচার করিবে।

২। অনন্তর নির্জ্জনে পবিত্র আসনে উপবেশন করতঃ

কিছুক্ষণ কুলদেবতার বা ইষ্টদেবতার মূর্ত্তি নিরীক্ষণ করিবে এবং ইষ্টদেবের নিকট প্রার্থনা করিবে।

৩। তদনন্তর চক্ষু মুদ্রিত করিয়া সেই মূর্ত্তি মানসনেত্রে দর্শন করিবে এবং অনন্যচিত্তে সেই প্রত্যক্ষ ইষ্টদেবের উদ্দেশে অন্যূন অষ্টোত্তর সহস্র সংখ্যক ইষ্টমন্ত্র জপ করিবে।

[বিবৃতি]

সন্ধ্যার পূর্ব্বেই সাংসারিক কার্য্য সমাপ্ত করিবে। অর্থাৎ দিবাবসানের সঙ্গে তোমার সাংসারিক কার্য্যেরও যেন অবসান হয়।

দিবাবসানে চিন্তা।

জন্মাবধি এ পর্য্যন্ত এই জগতে আমি বিস্তর ক্লেশ ভোগ করিয়াছি। আমার সমগ্র জীবনই ক্লেশময়। যাহাকে সুখ মনে করা যায়, প্রকৃতপ্রস্তাবে তাহাও সুখ নহে; তাহাও দুঃখের ক্ষণিক নিবৃত্তিমাত্র। আহার করিয়া আমরা সুখলাভ করিতে পারি না, ক্ষুধা-ব্যাধি হইতে ক্ষণিক নিবৃত্তি লাভ করি মাত্র। ফলতঃ ঔষধ-সেবনে সুখ নাই; ব্যাধিযন্ত্রণা হইতে কিছুক্ষণ নিষ্কৃতিলাভ করিমাত্র। সাংসারিক যাবতীয় সুখই এইরূপ অশেষ ক্লেশের ক্ষণিক নিবৃত্তিমাত্র।

জন্মাবধি মৃত্যু আমাকে যেন আকর্ষণ করিতেছে। মরিতেই হইবে, এ বিষয়ে সংশয় নাই, তথাপি আমি ঘোর মায়াবশে এই সংসারকে চিরস্থির মনে করি এবং কখনও স্বীয় মৃত্যুচিন্তা

করি না ; অথচ আমি মৃত্যুভয়ে সতত ভীত। প্রতিদিনই আমার আয়ুঃ ক্ষয় পাইতেছে। না জানি সেই মৃত্যুসময়ে কত যন্ত্রণাই পাইতে হইবে!

এই ত দিবাবসান হইল ; সূর্য্যদেব অস্ত-গমন করিলেন, আমাকেও একদিন মরিতে হইবে। আবার সূর্য্যের উদয় হইবে, আমাকেও আবার জন্মিতে হইবে। কালের ত অন্ত নাই। এই অনন্তকাল কি আমি কেবল অশেষ ক্লেশ ভোগ করিয়া এই জগতে জন্মিব এবং মরিব ? ! এই অনন্ত ক্লেশ-প্রবাহের কি নিবৃত্তি হইবে না ? এই ক্লেশমুক্তির কি উপায় নাই ?

এ বিষয়ে কেবল আমিই চিন্তা করিতেছি না ; অনাদি কাল হইতে কত মহাত্মা চিন্তা করিয়াছেন। কত মহাত্মা মহাজন এই অনন্ত ক্লেশপ্রবাহ হইতে নিষ্কৃতিলাভের পন্থাও নির্দ্দেশ করিয়াছেন। বিশেষতঃ এই আর্য্যভূমি ভারতে কত মহাত্মা আজীবন কেবল মুক্তিপথেরই অন্বেষণ করিয়াছেন। তবে ক্ষুদ্রবুদ্ধি আমি—মূঢ় আমি—আর কি চিন্তা করিব ? আর কি নূতন পন্থা আবিষ্কার করিব ? সম্মুখে ত প্রশস্ত মুক্তিপথ দেখিতেছি ; সুতরাং আর নূতন মুক্তিপথের প্রয়োজন কি ? যে পথ দেখিতেছি, সেই পথে গেলেই মুক্তি লাভ করা যায়। কিন্তু আমি মোহবশে সে পথে যাইতে পারিতেছি না। যে সংসারকে অনিত্য ও ক্লেশময় জানিতেছি— অনুভব করিতেছি, সেই সংসারেই আমার প্রবল আসক্তি রহিয়াছে, আমি পাশবদ্ধ পশুর ন্যায় নিয়ত সংসার-চক্রে ভ্রমণ করিতেছি এবং নিয়ত ক্লেশভোগ করিতেছি। এই

মায়াপাশ ছেদনের উপায় কি? এই পাশ ছেদন করিতে না পারিলে, আমি মুক্তিপথ অবলম্বন করিব কিরূপে? পাশ-বদ্ধ পশু স্বেচ্ছানুসারে কোথায়ও যাইতে পারে না; আমিও স্বেচ্ছানুসারে কোথায়ও যাইতে পারিতেছি না। আমার স্বাধীনতা নাই। কিরূপে আমি স্বাধীনতা পাইব? কে আমায় পাশমুক্ত করিবে? প্রভু ইচ্ছা করিলেই পশুকে পাশমুক্ত করিতে পারেন। আমারও অবশ্য প্রভু আছেন, আমি সেই প্রভুর একান্ত শরণাপন্ন হইলে তিনি অবশ্যই আমার বন্ধন মোচন করিবেন। অতএব আমি সেই ত্রিলোক-পতি সদ্‌গুরুর উপাসনা করি; তাঁহারই নিকট প্রার্থনা করি।

এবম্প্রকার চিন্তার পরে স্বীয় হোমগৃহে কবাট রুদ্ধ করিয়া শুদ্ধাসনে উপবেশন করতঃ দীপালোকে কুলদেবতার বা ইষ্টদেবতার মূর্ত্তি বা ছবি একাগ্রচিত্তে কিছুক্ষণ নিরীক্ষণ করিবে।*

পরে চক্ষু মুদ্রিত করিয়া মানসনেত্রে অবিকল সেই ছবি দেখিবে। যদি চক্ষু মুদ্রিত করিলে মানসনেত্রে সেই ছবি অবিকল সুস্পষ্ট দেখিতে না পাও, তবে পুনরায় চক্ষু উন্মীলিত

---

* তোমার পিতৃপিতামহাদি ঊর্দ্ধতন পুরুষগণ যে দেবতার উপাসক ছিলেন, সেই দেবতাকেই তুমি স্বীয় কুলদেবতা বা ইষ্টদেবতা বলিয়া জানিবে। অথবা যে দেবতা তোমার হৃদ্য বা প্রীতিকর, সেই দেবতাকেই তুমি স্বীয় ইষ্টদেব বলিয়া গ্রহণ করিবে। সেই কুলদেবতার বা ইষ্টদেবতার মূর্ত্তি বা ছবি সংগ্রহ করিবে। গুরু-কুলোৎপন্ন ভক্তিভাজন ব্যক্তির নিকট ইষ্টমন্ত্র গ্রহণ করিবে। তদ্‌ভাবে অন্য যে কোন ভক্তিভাজন ব্যক্তির নিকটেও মন্ত্র গ্রহণ করিতে পার।

করিয়া কিছুক্ষণ নিরীক্ষণ করিবে। অনন্তর চক্ষু মুদ্রিত করিয়া মানসনেত্রে সেই ছবি দেখিবে। এবং তাঁহাকেই ত্রিলোকপতি সদ্গুরু মনে করিয়া নিম্নলিখিত রূপ প্রার্থনা করিবে ;—

প্রার্থনা।

হে অনন্তদেব! আমার ক্ষুদ্র হৃদয় তোমার বিরাটমূর্ত্তি ধারণ করিতে অসমর্থ হওয়াতেই আমি তোমার এই মূর্ত্তি কল্পনা করিয়াছি।

হে ব্রহ্মন্! হে মঙ্গলময় দেব! তুমি এই মূর্ত্তিতে আবির্ভূত হইয়া ত্রিতাপক্লিষ্ট আমাকে বন্ধনমুক্ত কর। হে সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়কারিন্ প্রণবরূপি ভগবন্! হে সত্যস্বরূপ গুরুদেব! তুমি আমার মোহপাশ ছেদন কর।

এ প্রার্থনার পরেই চক্ষু মুদ্রিত রাখিয়াই এবং ইষ্টমূর্ত্তি মানসনেত্রে নিরীক্ষণ করিতে করিতেই ইষ্টমন্ত্র জপ করিতে আরম্ভ করিবে।

জপ।

একাসনে বসিয়া অন্যূন এক হাজার আট বার মন্ত্র জপ করিতে হইবে।

জপ করিবার সময় মানসনেত্রে ইষ্টদেবের মূর্ত্তি নিরীক্ষণ করিতে হইবে, অথচ জপসংখ্যাও রাখিতে হইবে, এই জন্য এক হাজার আটটী গুটিকা-বিশিষ্ট মালার প্রয়োজন।

রুদ্রাক্ষ বা তুলসী মালাই প্রশস্ত। তদভাবে অন্য যে কোনরূপ মালা গ্রহণ করিতে পার।*

জপ করিবার সময় দন্ত চাপিয়া রাখিবে, ওষ্ঠাধরও সম্মিলিত রাখিবে; জিহ্বাও স্থির রাখিবে; কেবল জিহ্বা-মূল ও কণ্ঠনালীর সাহায্যে মন্ত্র জপ করিবে। হোমের সময়ও এইরূপে জপ করিতে হইবে।

দিবাভাগে সাংসারিক কার্য্যের অবসরেও জপ করিবে; কিন্তু সেই সময় জপসংখ্যা রাখিবার প্রয়োজন নাই।

[প্রকাশ্য স্থানে অর্থাৎ কাহারও সাক্ষাতে কখনও মালা জপ করিবে না]।

কিন্তু যখনই যে কার্য্য করিবে, তখনই সেই কার্য্যে একাগ্র মনোযোগ দেওয়া আবশ্যক। অতএব জপ করিলে যদি সাংসারিক কার্য্যের হানি হয়, তবে জপ করিবে না। অবসর পাইলেই জপ করিবে। কিন্তু রাত্রিতে যখন

---

* নিম্নলিখিতরূপ সহজ-উপায়ে মালা প্রস্তুত করিয়া লওয়াই সুবিধা যথা;— এক হাজার নয়টী সাদা মটর ভিজাইয়া রাখিবে। নরম হইলে সূচীদ্বারা এক হাজার আটটী মটর সূত্রে গ্রথিত করিয়া গ্রন্থি দিবে। গ্রন্থিস্থলে অর্থাৎ মালার বাহিরে অবশিষ্ট মটরটী গাঁথিয়া রাখিবে। তদ্দ্বারা জপসমাপ্তি সময়ে এক হাজার আট বার জপ করা হইয়াছে বলিয়া সহজেই বুঝিতে পারিবে। সুতরাং জপ করিবার সময় সংখ্যার প্রতি আর মনোযোগ দিবার প্রয়োজন হইবে না। মালা ছোট হইলে কাজেই সংখ্যার প্রতি মনোযোগ দেওয়া আবশ্যক হয়; সেই জন্য এক হাজার আটটী গুটিকাবিশিষ্ট বৃহৎ মালারই প্রয়োজন। জপ-সংখ্যার প্রতি মনোযোগ দিতে গেলেই ধ্যানের ব্যাঘাত হয়; কিন্তু ধ্যানসহকৃত জপই আবশ্যক।

জপ করিবে, তখন সাংসারিক কার্য্যের চিন্তা করিবে না ; একথা বলাই বাহুল্য।

এক লক্ষ জপ-সমাপ্তি হইলেই মনোবাঞ্ছা সফল হইবে ; এবং তখন পরম তৃপ্তি অনুভব করিতে পারিবে।

(৫) ব্রহ্মচর্য্য।

১। স্ত্রী-সঙ্গ পরিত্যাগ করিবে এবং অষ্টাঙ্গ মৈথুন পরিত্যাগ করিবে।

[বিবৃতি]

অষ্টোত্তর সহস্র জপ সমাপ্তির পরে রাত্রিকালের আহার গ্রহণ করিবে। আহারান্তে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিবে ; সেই বিশ্রামের সময় সর্ব্বচিন্তা পরিত্যাগ করিয়া মনকে নিশ্চিন্ত করিবে। মন কিছুক্ষণ নিশ্চিন্ত হইলেই নিদ্রাবেগ উপস্থিত হইবে। তখন পরিষ্কৃত শয্যায় একাকী শয়ন করিবে। যদি শয়নগৃহে স্ত্রীর সহিত বা অন্যান্য ব্যক্তির সহিত শয়ন করা নিতান্ত আবশ্যক হয়, তাহা হইলেও সংস্পর্শরহিত পৃথক্ শয্যায় শয়ন করিবে।

যতদিন শরীর সম্পূর্ণ নীরোগ না হইবে, ততদিন স্ত্রী-সহবাস করিবে না, ইহা বলাই বাহুল্য। স্ত্রী-সহবাস দূরে থাক, স্ত্রীর মুখদর্শন করিবে না, স্ত্রীর সহিত কথোপকথন করিবে না। স্ত্রীর বিষয় চিন্তাও করিবে না। যেহেতু তদ্রূপ করিলেই

শোণিত হইতে বীর্য্যবিন্দু পৃথক্ হইয়া পড়িবে এবং ব্রহ্ম-চর্য্যের ব্যাঘাত ঘটিবে।

শয়ন করিবামাত্র যদি নিদ্রাবেশ না হয়, তবে শয়ন করিয়াও ধ্যানসহকারে জপ করিবে। এই সময়ে জপের সংখ্যা রাখিবার প্রয়োজন নাই। জপ করিতে করিতেই নিদ্রাবেশ হইবে।

প্রশ্নোত্তরমালা।

গুরুশিষ্য-সংবাদ।

প্রথম পরিচ্ছেদ—জ্ঞানবৈরাগ্য-সম্বন্ধে।

১ প্রশ্ন। গুরুদেব, "পশ্বাচার" কিরূপ, তাহা, আপনার মুখে শুনিলাম; পশ্বাচার যে সকলের পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা সুগম যোগসাধন, তাহাও আপনার মুখে শুনিয়াছি। এক্ষণে জিজ্ঞাসা করি, (১) শৌচ, (২) হোম, (৩) মিতাহার, (৪) ধ্যান ও জপ এবং (৫) ব্রহ্মচর্য্য, এই পঞ্চ আচারকে পশ্বাচার বলে কেন? পশ্বাচারের উদ্দেশ্যই বা কি?

উত্তর। মায়াবদ্ধ জীব পশুশব্দবাচ্য, এবং মায়ামুক্ত জীব শিবশব্দবাচ্য। পশুর পক্ষে বিহিত আচারকেই পশ্বাচার বলে। অর্থাৎ মায়ারূপ পাশদ্বারা বদ্ধ জীব যেরূপ আচরণ দ্বারা শিবত্ব বা মুক্তি লাভ করিতে পারে, সেই আচরণের নামই পশ্বাচার। যোগসাধনের উদ্দেশ্য মুক্তি; সুতরাং পশ্বাচারের উদ্দেশ্য মুক্তি।

২ প্র। মুক্তি কি? মুক্তির প্রয়োজন কি?

উ। সমস্ত ক্লেশ হইতে অব্যাহতি পাওয়ার নামই মুক্তি। জীবমাত্রেই ক্লেশমুক্ত হইতে প্রার্থনা করে, সেই জন্যই মুক্তির প্রয়োজন।

৩ প্র। ক্লেশ কি? ক্লেশের হেতুই বা কি?

উ। প্রধানতঃ মায়া বা মোহকেই ক্লেশ বলা যায়। মায়া হইতেই (১) অবিদ্যা, (২) অস্মিতা, (৩) রাগ, (৪) দ্বেষ এবং (৫) অভিনিবেশ, এই পঞ্চ ক্লেশের উৎপত্তি হয়। কর্ম্মাশয় অর্থাৎ বাসনা বা প্রবৃত্তিই মায়ার হেতু, সুতরাং প্রবৃত্তিই সমস্ত ক্লেশের মূল বা নিদান।

৪ প্র। ভগবন্, বাসনা বা প্রবৃত্তিই যখন সকল ক্লেশের মূল, তখন বুঝিলাম প্রবৃত্তি বা বাসনার নিবৃত্তি হইলেই ক্লেশের নিবৃত্তি হয়; সুতরাং বাসনার নিবৃত্তিই মুক্তি। বাসনারই নাম কর্ম্মাশয়; কিন্তু দেব, কর্ম্মাশয় ব্যতীত কোন কর্ম্মই ত করা যায় না; পশ্বাচার পালন করিতে হইলেও কর্ম্ম করিতে হইবে; সুতরাং তদ্দারা মুক্তি কিরূপে হইবে? এই বিষয়টা আমাকে সহজ কথায় বুঝাইয়া দিউন্।

উ। হাঁ, বাসনার নিবৃত্তির নামই মোক্ষ। বাসনা, প্রবৃত্তি এবং কর্ম্মাশয়, একার্থবাচকও বটে। পশ্বাচারও কর্ম্ম, তাহাতে সন্দেহ নাই; কিন্তু আমরা বহুজন্ম কর্ম্মাশয় বা বাসনার বশেই মানব জন্ম লাভ করিয়াছি। সেই সঞ্চিত কর্ম্মাশয়ের জন্য এই সংসারে আমাদিগকে কর্ম্ম করিতেই হইবে। তবে কর্ম্ম দুই প্রকার; (১) সৎকর্ম্ম বা সুকৃতি বা পুণ্য এবং (২) দুষ্কর্ম্ম বা দুষ্কৃতি বা পাপ। সুকৃতির ফল বা পরিণাম সুখ; এবং দুষ্কৃতির ফল দুঃখ। এই সুখ-দুঃখের অতীত অবস্থাই মুক্তি। অর্থাৎ সৎকার্য্য ও ও দুষ্কার্য্য উভয়বিধ কর্ম্মাশয় হইতে উত্তীর্ণ হইলেই মুক্তি লাভ করা যায়। কিন্তু এই মুক্তি সহজলভ্য নহে; অর্থাৎ সহজে কেহই কর্ম্মাশয় পরিত্যাগ করিতে পারে না। অগ্রে দুষ্কৃতি বা দুষ্কর্ম্মাশয় পরিত্যাগ করিয়া সুকৃতি বা সৎকর্ম্মাশয় অবলম্বন করিয়া সাংসারিক সামান্য

দুঃখের হস্ত হইতে মুক্তিলাভ করা কর্ত্তব্য। পরে ক্রমশঃ সুকৃতি বা সৎকর্ম্মাশয়ও পরিত্যাগ করা আবশ্যক। পশ্বাচার এই সুকৃতিসাধনমাত্র। এতদ্দ্বারা সামান্য সাংসারিক দুঃখের তিরোধান হয়। এবং এই পশ্বাচারই ক্রমশঃ নিষ্কাম পথে নীত করিয়া অনন্ত মুক্তি-পথের অধিকারী করে।

সাংসারিক বিবিধ দুঃখের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভের জন্য অগ্রে অভিলাষ করা আবশ্যক। এবং সেই জন্যই সুকৃতির বা সৎকর্ম্মের প্রয়োজন। পশ্বাচার সেই সৎ-কর্ম্ম। পশ্বাচার দ্বারা আধিব্যাধি সমস্ত তিরোহিত হয়। সুতরাং তদ্দ্বারা আধিদৈবিক, আধিভৌতিক ও আধ্যাত্মিক ত্রিবিধ দুঃখেরই উপশান্তি হয়। দুঃখের উপশান্তি হই-লেই সুখলাভ হয়; ক্রমে সেই সুখেও বিতৃষ্ণা বা বৈরাগ্য জন্মিলে, জন্মান্তর গ্রহণের প্রবৃত্তি থাকে না। জন্মান্তর গ্রহণের প্রবৃত্তি না থাকিলে কর্ম্মাশয় বা বাসনাও থাকিতে পারে না; সুতরাং তদ্রূপ অবস্থাই মুক্তি। সেই জন্যই পশ্বাচার মুক্তিপথের সহায়।

প্র। ভগবন্, সুখে বিতৃষ্ণা বা বৈরাগ্য হইবে কিরূপে, আমি বুঝিতে পারিতেছি না। সহজ কথায় আমায় বুঝাইয়া দিউন্।

উ। যে রোগী, সে প্রথমে আরোগ্য প্রার্থনা করে; যেহেতু রোগযন্ত্রণা অতীব ক্লেশদায়ক। সেই জন্য রাজাধিরাজও পীড়িত হইলে সামান্য মুটে-মজুরের স্বাস্থ্য দেখিয়াও তাঁহার ঈর্ষ্যা জন্মে এবং সেই মুটে-মজুরকেও তিনি আপনার অপেক্ষা সুকৃতিবান্ ও সুখী মনে করেন।

কিন্তু সেই রাজাধিরাজ রোগমুক্ত হইয়া যখন আরোগ্য বা স্বাস্থ্য লাভ করেন, তখন তদবস্থাতেও তিনি সুখের বাসনা ক্ষান্ত করিতে পারেন না; অর্থাৎ স্বাস্থ্যলাভ করিয়াও তাঁহার তৃপ্তিলাভ হয় না। তিনি বিষয়ভোগে আসক্ত হইয়া আরও অধিক সুখের বাসনা করেন। এই অধিক সুখের বাসনাই তাঁহাকে ভোগে আসক্ত করে এবং সেই ভোগই পুনরায় রোগ আনয়ন করিয়া তাঁহাকে পুনরায় রোগযন্ত্রণায় বা দুঃসহ দুঃখে পাতিত করে। তখন তিনি আবার স্বাস্থ্যলাভের জন্য লালায়িত হন। এইরূপে পুনঃ পুনঃ রোগভোগ এবং স্বাস্থ্যলাভ করিয়া মহারাজের এই জ্ঞানলাভ হয় যে, "এ সংসারে একমাত্র স্বাস্থ্যই পরম সম্পত্তি; বিষয়ভোগবাসনা প্রবল হইলেই তাহাতে আসক্তি জন্মে; সেই আসক্তিই মোহ উৎপন্ন করে; এবং মোহ হইতেই ক্লেশের উৎপত্তি হয়। অতএব এ সংসারে বিষয়ভোগ-বাসনা পরিত্যাগ না করিলে শান্তির আশা নাই।" যখন এইরূপ জ্ঞান দৃঢ় হয়, তখনই সংসার-বৈরাগ্য বা বাসনা-ত্যাগের সূত্রপাত হয়।

ফলতঃ, এই সংসারে লোকে প্রথমে দুঃখ ত্যাগ করিতে চায়, এবং সুখলাভ করিতে চায়; কিন্তু পরিশেষে বুঝিতে পারে যে, "নিরবচ্ছিন্ন সুখ এ সংসারে নাই।" সুতরাং তখন সুখ ও দুঃখ উভয়ই হেয় বলিয়া উপলব্ধি জন্মে। তদ্রূপ উপলব্ধি জন্মিলেই জীব মুক্তির পথে অগ্রসর হয়।

৩ প্র। সচরাচর লোকে সম্পত্তিশালী ব্যক্তিদিগকেই সুকৃতিমান্ বলিয়া বিশ্বাস

করে ; এই বিশ্বাসের হেতু কি ? যখন রাজ-মহারাজ প্রভৃতিকেও নানাবিধ রোগ ও উদ্বেগ ভোগ করিতে দেখা যায়, তখন তাহাদিগকে সুকৃতিবান্ বলা যায় কিরূপে ? বিশেষতঃ সামান্য মুটে-মজুর প্রভৃতিকে যখন স্বাস্থ্যসুখ ভোগ করিতে দেখা যায়, তখন তাহাদিগকেই ত সুকৃতিবান্ বলা যায় ?

উ। মুক্তির পথ যাহার সন্নিহিত, সেই ব্যক্তিই সুকৃতিবান্। সম্পত্তিশালী ব্যক্তিদের মুক্তির পথ অন্যান্য ব্যক্তির অপেক্ষা সন্নিহিত বলিয়াই লোকে তাহাদিগকে সৌভাগ্যবান্ বা সুকৃতিবান্ বলিয়া থাকে বা বিশ্বাস করে। এই বিশ্বাসের হেতু এই যে, সম্পত্তিশালী বা ঐশ্বর্য্যশালী ব্যক্তিরাই সহজে বৈরাগ্য অবলম্বন করিয়া থাকেন। তাঁহারা সহজেই সাংসারিক বিষয়ভোগের অসারতা উপলব্ধি করিতে পারেন।

সামান্য মুটে-মজুর প্রভৃতি স্বাস্থ্যসুখ ভোগ করে বটে, কিন্তু তাহাদের সাংসারিক বাসনা অতীব প্রবল ; তাহারা তিলার্দ্ধের জন্যও আপনাদিগকে সুখী বলিয়া অনুভব করিতে পারে না ; তাহারা সম্পত্তিলাভের জন্যই লালায়িত হইয়া জন্ম-জন্মান্তর ক্রমাগত দুঃসহ পরিশ্রম করিয়া থাকে; বহুজন্মান্তে তাহারা স্ব স্ব কর্ম্মাশয়ের জন্য সম্পত্তি লাভ করিতে পারে। এই জন্যই সম্পদ্‌কে সাধনার ধন বা ঐশ্বর্য্য বলে। বহুজন্মের সঞ্চিত কর্ম্মাশয়ের বশবর্ত্তী হইয়া কর্ম্ম করিয়া শেষে লোকে একান্ত প্রার্থিত সম্পত্তি লাভ করে। সম্পত্তিই সুখমূলক বলিয়া সামান্য লোকের দৃঢ় বিশ্বাস থাকে, সেই জন্যই সম্পত্তি-লাভে লোকে এত বিব্রত হইয়া থাকে।

কিন্তু সাংসারিক সম্পত্তিলাভের পরে বুঝিতে পারে যে, পার্থিব ভোগের সহিতও দুঃখের অবিচ্ছিন্ন সম্বন্ধ। ফলতঃ সুখের সঙ্গেও দুঃখ ছায়ার ন্যায় অনুসরণ করে। এইরূপ উপলব্ধির পরেই সংসার-বৈরাগ্য উপস্থিত হয়। সেই বৈরাগ্যই মুক্তিপথে লইয়া যায়।

সাংসারিক বিষয় অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ভোগ্য পদার্থচয় জীবকে মোহবন্ধনে বা মায়াপাশে বদ্ধ করিয়া থাকে। এই মোহ অতীব প্রবল। সেই মোহ জীবকে বিষয়ভোগে বিব্রত করিয়া থাকে। সেই বিষয়ভোগের জন্যই সকলে সম্পত্তির কামনা করে। যেহেতু সম্পত্তির দ্বারাই সহজে বিষয়ভোগ করা যায়। কিন্তু লোকে "দিল্লীকা লাড্ডু" শুনিলেই যেমন তাহাকে অতীব উপাদেয় পদার্থ মনে করে এবং তাহা উপভোগের জন্য লালসা করে, অথচ সেই "দিল্লীকা লাড্ডু" ভোজন করিয়া তাহার জঘন্যতা বুঝিতে পারে, তদ্রূপ সম্পত্তিশালী হইয়া লোকে বিষয়ভোগ করিয়াই বিষয়ের অসারতা উপলব্ধি করিতে পারে। এবং তদ্রূপ উপলব্ধি হইলেই লোকে সহজেই এই সংসার-বন্ধন হইতে মুক্তিলাভের প্রার্থনা করে। তখন সহজেই সদ্গুরু লাভ করিয়া সেই মুক্তির পথও প্রাপ্ত হয়। অতএব সম্পত্তিশালী ব্যক্তিদিগকে লোকে কেন যে সৌভাগ্যবান্ বা সুকৃতিবান্ বলিয়া থাকে, তাহার কারণ বুঝিয়া দেখ।

৭ প্র। তবে কি দরিদ্রের গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়া কেহ সন্ন্যাসী হইতে পারে না? এবং সন্ন্যাসী হইলেও কি মুক্তিলাভ করিতে পারে না?

উ। সাধারণতঃ দরিদ্রসন্তান সন্ন্যাস অবলম্বন করিতে পারে না। যেহেতু তাহার ভোগ-লালসা নিবৃত্তির সম্ভাবনা অল্প। কিন্তু অনেক মহাত্মা দরিদ্রের গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়াও পূর্ব্বজন্মসঞ্চিত সুকৃতির বশে সন্ন্যাস অবলম্বন করিয়া থাকেন। এমন কি অতুল বিভবশালী রাজাধিরাজও বিষয়বিতৃষ্ণ হইয়া "দরিদ্র-জীবনই মুক্তিপ্রদ" এইরূপ সঙ্কল্পের বশীভূত হইয়া দরিদ্রগৃহে জন্মলাভ করিতে পারেন এবং দরিদ্র অবস্থাতেই পরম সন্তোষ উপভোগ করিয়া সন্ন্যাস অবলম্বন করিতে পারেন। তদ্রূপ সন্ন্যাসী অবশ্যই মুক্তিলাভ করিয়া থাকেন। কিন্তু এই প্রকার সন্ন্যাসী সংসারে অতি বিরল। অধিকাংশ ব্যক্তিই সম্পদ্ পরিত্যাগ করিয়াই সন্ন্যাসী হইয়া থাকেন।

তবে দরিদ্রের গৃহে জন্মিয়াও অনেকে সন্ন্যাসী হয় বটে, কিন্তু প্রকৃতপ্রস্তাবে তাহারা সন্ন্যাসী নামের অযোগ্য। তাঁহারা অর্থাভাবে পিতামাতা-স্ত্রী-পুত্রাদির নিকট অনাদৃত বা তিরস্কৃত ও সমাজে অন্যান্য লোকের নিকট অপমানিত ও অপদস্থ হইয়া সহজে বিরক্ত হইয়া সংসার আশ্রম হইতে পলায়ন করে। এরূপ অবস্থায় অনেকে মূর্খতাবশে আত্মহত্যাও করিয়া থাকে। যাহারা আত্মহত্যা না করে, তাহারা সন্ন্যাসী হয়। ইহাদিগকে ভেকধারী সন্ন্যাসী বলা যায়। কিন্তু প্রকৃতপ্রস্তাবে ইহারা সন্ন্যাসী নহে; কেননা বিষয়-বাসনা ইহাদের হৃদয়ের অভ্যন্তরে প্রবলভাবেই বিদ্যমান থাকে। বিষয়বাসনা

পরিত্যাগের নামই সন্ন্যাস। সুতরাং ভেকধারী হইলেই সন্ন্যাসী হয় না। যাহাদের মনে সাংসারিক ধন মান প্রভৃতির আকাঙ্ক্ষা প্রবল, তাঁহারা সন্ন্যাসী নামের অযোগ্য। যাঁহার ক্লেশ দূর হইয়াছে, যিনি কোন প্রকার অভাব বোধ করেন না, অর্থাৎ যাঁহার কিছুরই অভাব নাই, তিনিই যথার্থ সন্ন্যাসী বা পরমহংস-পদবাচ্য, এবং তিনিই যথার্থ জীবন্মুক্ত পুরুষ।

। জন্মান্তর সম্বন্ধে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মে কিরূপে? ভূত-প্রেত-পিশাচাদি প্রেতাত্মা এবং দেবতা প্রভৃতি মহাত্মার কথা শুনিতে পাওয়া যায় এবং পরীক্ষা দ্বারাও তাহাদের অস্তিত্ব সম্বন্ধে অনেক পরিচয় পাওয়া যায় বটে, কিন্তু তথাপি সেই বিশ্বাস অন্তরে দৃঢ় হয় না কেন?

। জন্মান্তর সম্বন্ধে দৃঢ়বিশ্বাস জন্মিলেই সংসার-বৈরাগ্য জন্মে এবং সংসার-বৈরাগ্য জন্মিলেও জন্মান্তর-বিশ্বাস জন্মে। অতএব জন্মান্তর-বিশ্বাস এবং বৈরাগ্য এই উভয়ের পরস্পর জন্যজনক সম্বন্ধ। জীবগণ ঘোর মায়াচ্ছন্ন বলিয়াই জন্মান্তর বিষয়ে দৃঢ়বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারে না। ফলতঃ যে সকল মনুষ্যের বিষয়-ভোগলালসা যত প্রবল, সেই সকল মনুষ্যেরই জন্মান্তর-বিশ্বাস তত‍ই অল্প। এই জন্যই পাশ্চাত্য পণ্ডিতদিগের জন্মান্তর-বিশ্বাস নাই বলিলেও হয়। কিন্তু "আত্মা অমর" এই কথা পৃথিবীর সর্ব্বত্র জ্ঞানিগণের মধ্যে প্রচলিত আছে এবং পৃথিবীর সর্ব্বশাস্ত্রেই নির্দ্দিষ্ট আছে। যাহা হউক সেই "আত্মা" যে কিরূপ, তদ্বিষয়ে কেবল আর্য্যস্থানে আর্য্যশাস্ত্রেই সম্যক্ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, অন্যত্র হয় নাই।

কিন্তু "মরিলেই সব ফুরাইয়া যায়" এরূপ বিশ্বাস অত্যল্পসংখ্যক নাস্তিকেরও আছে কি না সন্দেহ। মৃত্যুর পরেও "আত্মা" পরলোকে সুখদুঃখ ভোগ করে, এই বিশ্বাস জগতের সর্ব্বত্রই প্রসিদ্ধ। কিন্তু এই বিশ্বাস প্রসিদ্ধ হইলেও—মুখে সকলে বলিলেও—ইহা অন্তরে দৃঢ়রূপে অঙ্কিত হয় না; না হইবার কারণ কেবল মোহ বা মায়া বা অজ্ঞানতা।

ফলতঃ "মৃত্যুর পরে পরলোকে সুখদুঃখ ভোগ হয়" এই বিশ্বাস হৃদয়ে দৃঢ়বদ্ধ হইলেই মনুষ্যের সৎকার্য্যে প্রবৃত্তি এবং দুষ্কার্য্যে নিবৃত্তি হইয়া থাকে। কিন্তু মোহ-বশতঃ পরলোকে দৃঢ়বিশ্বাস নাই বলিয়াই লোকে অসৎ-কার্য্য হইতে নিবৃত্ত হয় না।

ভূতপ্রেতাদি সম্বন্ধে পৃথিবীর সর্ব্বত্রই জনশ্রুতি আছে। ভূতপ্রেতাদির অস্তিত্ব অনেকেরই প্রত্যক্ষ বিষয়। উন্নত দেবাত্মাদেরও অস্তিত্ব অনেকের প্রত্যক্ষ অনুভূতির বিষয়। অতএব তাহাদের অস্তিত্বসম্বন্ধে যে বিশ্বাস হৃদয়ে দৃঢতাপ্রাপ্ত হয় না, তাহারও কারণ কেবল মোহ বা অবিদ্যা।

৯ প্র। কখন কখন ভূতের উৎপাত প্রত্যক্ষ করা যায় বটে; কিন্তু পূর্ব্বকালে যত অধিক উপদ্রব ছিল, অধুনা তত নাই। "গয়াক্ষেত্রে পিণ্ডদান করিলে প্রেতের উদ্ধার বা মুক্তি হয়" এই চিরপ্রসিদ্ধ প্রবাদ সত্য কি না?

উ। মৃত্যু হইলে স্থূলদেহ হইতে সূক্ষ্মদেহ জীবাত্মার সহিত নির্গত হয়; সেই নির্গত জীবকেই প্রেত বলে। জীবিত অবস্থায় সমগ্র বাসনা বা সংস্কার সেই জীবে বর্ত্তমান

থাকে। সেই বাসনা বা সংস্কারের জন্যই সেই প্রেতাত্মা পুনরায় যথাকালে জন্মগ্রহণ করে অর্থাৎ পুনরায় স্থূল শরীর প্রাপ্ত হয়। কিন্তু সকল প্রেতাত্মার মরণের অব্যবহিত পরেই জন্মগ্রহণ হয় না।

যাহারা অপঘাতে মৃত্যুগ্রস্ত হয়, তাহারা প্রেতাবস্থাতেও কিছুকাল মৃত্যুকালীন যাতনা ভোগ করিয়া থাকে। সেই যাতনা নিবৃত্তির জন্য অনেক সময় সেই প্রেতাত্মারা উপদ্রব করিয়া থাকে। অথবা মৃত্যুকালীন সংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়া অনেক পার্থিব কার্য্যেও লিপ্ত হয়।

মনেকর, কোন একটী হিন্দু গৃহস্থ স্ত্রীলোক হঠাৎ অগ্নিদগ্ধ হইয়া মরিল; মৃত্যুকালে সে অশেষ যন্ত্রণা পাইল; এবং "আমার অপমৃত্যু ঘটিল, আমি অতি পাপীয়সী, আমার সদ্গতি হইবে না" এবম্প্রকার সংস্কার মৃত্যুকালে তাহাকে অধিকতর যাতনা প্রদান করিল। মৃত্যুর পরেও তাহার প্রেতাত্মা সেই সংস্কারবশেই যাতনা ভোগ করিতে থাকিবে। পরিশেষে সেই যাতনা হইতে নিষ্কৃতিলাভের জন্য সেই প্রেতাত্মা আর একটী চিরবদ্ধমূল সংস্কার অনুসরণ করিবে; "গয়ায় পিণ্ডদান করিলেই আমার উদ্ধার সাধন হইবে" এই সংস্কার জাগরিত হইলেই সে জীবিত আত্মীয় বন্ধুজনের নিকট উৎপাত আরম্ভ করিবে। আত্মীয় ব্যক্তিরা এই ভৌতিক উৎপাত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য গয়াতে পিণ্ডদান করিলেই সেই প্রেতাত্মার মনের তৃপ্তি হইবে; সে তখন সংস্কারসম্ভূত বা কাল্পনিক যাতনা হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারিবে।

কিন্তু সে তাহার চিরাভ্যস্ত সমস্ত সংস্কার বা বাসনা হইতে নিষ্কৃতি পায় না। সমস্ত সংস্কার বা কর্ম্মাশয় হইতে নিষ্কৃতি লাভ করা বহু জন্মের সাধনাসাপেক্ষ।

অধুনা প্রেতাত্মাদিগের উৎপাত দেখা যায় না, ইহার কারণ এই যে, এখন "গয়ায় পিণ্ডদান করিলে উদ্ধার হয়" এ সংস্কার প্রায় বিলুপ্ত হইয়াছে।

তবে পরীক্ষা করিয়া দেখিলে এখনও প্রেতাত্মার কার্য্য সুস্পষ্ট দেখিতে পাইবে।

যে সকল স্ত্রীলোক প্রসবের অব্যবহিত পরেই জীবিত সন্তান রাখিয়া মৃত্যুগ্রস্ত হয়, তাহারা প্রসূত সন্তানের প্রতি মায়াবশে সেই সন্তানের নিকট সর্ব্বদা অবস্থিতি করে। সন্তান যদি কখনও একাকী গৃহে থাকে, তবে সেই প্রেতাত্মা তাহাকে ক্রোড়ে স্থাপন করিয়া স্তনপান করায়; কিন্তু সেই প্রেতাত্মার স্তন্য দ্বারা বালকের ক্ষুধা-নিবৃত্তি না হইলেও সেই প্রেতাত্মা স্বীয় সংস্কারবশে তৃপ্তি লাভ করে। সে স্বীয় সন্তানকে স্থানান্তরিত করে, অথচ সন্তানের কিছুমাত্র অনিষ্ট হয় না। ইহা বহুল পরীক্ষা-সিদ্ধ ব্যাপার। এই সকল বিষয় পরীক্ষা করিয়া দেখা কর্ত্তব্য; তাহা করিলে জন্মান্তর-বিশ্বাস দৃঢ় হইতে পারে।

১০প্র। ভগবন্, যাহাদের পরকালে বিশ্বাস নাই, এবং গুরুজনেও ভক্তি নাই, তাহাদের মুক্তির উপায় কি ?

উ। বিশ্বাস এবং ভক্তি উভয়ই জ্ঞানমূলক; জ্ঞান ব্যতীত বিশ্বাসও হয় না, ভক্তিও হয় না। কিন্তু মনুষ্যমাত্রেরই

জ্ঞান আছে, সুতরাং মনুষ্যমাত্রেরই বিশ্বাস ও ভক্তি আছে। তবে মোহ ও মায়া দ্বারা সেই জ্ঞান আচ্ছন্ন থাকে বলিয়াই মনুষ্যের মনে বিশ্বাস এবং ভক্তি দৃঢ় হইতে পারে না। রজোগুণ ও তমোগুণ দ্বারাই জ্ঞান আচ্ছন্ন থাকে; সুতরাং রজোগুণ ও তমোগুণই মোহ বা অজ্ঞানতার হেতু; অতএব রজোগুণ ও তমোগুণ যাহাতে হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়া সত্ত্বগুণের বৃদ্ধি হয়, তদ্রূপ আচরণ করিলেই জ্ঞানের বিকাশ হয়; এবং জ্ঞানের বিকাশ হইলেই বিশ্বাস ও ভক্তির উদ্রেক হয়।

যেরূপ আচরণ দ্বারা সেই রজোগুণ ও তমোগুণ হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়া সত্ত্বগুণের বৃদ্ধি বা জ্ঞান বিকাশ হয়, সেই আচরণ "পশ্বাচার" নামে খ্যাত।

১১প্র। কিন্তু পশ্বাচার পালন করিতে হইলেই অগ্রে বিশ্বাস ও ভক্তির প্রয়োজন, সে বিশ্বাস ও ভক্তি কিরূপে জন্মিবে? পশ্বাচার পালন করিতে হইলেই সাত্ত্বিক আহার আবশ্যক, হোম, জপ, ধ্যান ও ব্রহ্মচর্য্য আবশ্যক; কিন্তু মোহান্ধ মানব স্বীয় প্রবৃত্তি ত্যাগ করিয়া কিরূপে এই সকল আচরণ করিবে? যাহারা কামপরায়ণ ও মৎস্য-মাংস-মাদক-সেবনে চিরাভ্যস্ত, তাহারা সেই অভ্যাস ত্যাগ করিবে কিরূপে?

উ। রোগযন্ত্রণা হইতে নিষ্কৃতি লাভের জন্য রোগীরা অনেক বিস্বাদ ঔষধ সেবন করিতে বাধ্য হয়। অতএব মনুষ্যের পক্ষে যাহা আপাততঃ অমঙ্গল, তাহাই পরিণামে মঙ্গল রূপে পরিণত হয়। মোহান্ধ মানবগণের পক্ষে ব্যাধি-যন্ত্রণাই পরম শিক্ষাপ্রদ। কিছুদিন পশ্বাচার পালন করিলেই ব্যাধিযন্ত্রণার লাঘব হইবে, এবং সাংসারিক অবস্থারও উন্নতি হইবে, তখন সহজেই বিশ্বাস ও ভক্তির

উদয় হইবে এবং চিরজীবন পথ্যাচার পালন করিবার প্রবৃত্তি জন্মিবে।

আত্মা জ্ঞানস্বরূপ। সেই আত্মা যখন বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণ বিশিষ্ট বুদ্ধিতে প্রতিবিম্বিত হয়, তখনই জ্ঞানের বিকাশ হয়; কিন্তু বুদ্ধি বা অন্তঃকরণ রজোগুণ ও তমোগুণ দ্বারা মলিন হইলে জ্ঞানের বিকাশ হয় না; যে জ্ঞান ভক্তি ও বিশ্বাসের কারণ, সেই জ্ঞানই মলিন অবস্থায় ঈর্ষ্যা ও নাস্তিকতা বা মূঢ়তার কারণ হয়। অন্যের উৎকর্ষ দেখিলে রাজসিক ও তামসিক নীচ মনে ঈর্ষ্যার উদয় হয়, কিন্তু নিজের অপকর্ষ জ্ঞান জন্মে না। মূঢ় ব্যক্তিরা আপনার অপেক্ষা অন্যের সুখসমৃদ্ধি দেখিলেই ঈর্ষ্যান্বিত হয়; কিন্তু সেই ঈর্ষ্যা অন্যের অপকার সাধনেই প্রবৃত্তি জন্মায়। নিজের উৎকর্ষসাধনে প্রবৃত্তি জন্মায় না। ফলতঃ তাহাদের নিজের অপকর্ষ জ্ঞানই নাই। কিন্তু সত্ত্বগুণপ্রধান ব্যক্তিরা অন্যের উৎকর্ষ দেখিয়া স্বীয় অপকর্ষ বুঝিতে পারেন, এবং আত্মোৎকর্ষ বিধানে যত্নবান্ হন। অন্যের উৎকর্ষ এবং নিজের অপকর্ষ বোধের নামই ভক্তি। অতএব ভক্তি আর ঈর্ষ্যা মূলতঃ একই পদার্থ।

তমোগুণাচ্ছন্ন মূঢ় ব্যক্তি প্রত্যহ শত শত ব্যক্তির মৃত্যু প্রত্যক্ষ করিয়াও বুঝিতে পারে না যে, "আমাকেও একদিন মরিতে হইবে" সেই জন্যই সে ইহলোকে মত্তমাতঙ্গের ন্যায় স্বেচ্ছাচারী হইয়া থাকে। কিন্তু শেষে রোগে শোকে জর্জ্জরিত হইয়া—প্রকৃতির হস্তে নিষ্পেষিত

হইয়া অতি বিকটবেশধারী অশেষ যন্ত্রণাদায়ক মৃত্যুকে সন্নিহিত বুঝিয়া মরণভয়ে অস্থির হইয়া পড়ে।

কিন্তু সত্ত্বগুণপ্রধান ব্যক্তি অন্যের মৃত্যু দেখিলেই স্বীয় মৃত্যু সান্নিহিত বলিয়া বুঝিতে পারেন এবং জন্ম-জরামরণ-রূপ ক্লেশদায়ক অনন্ত প্রবাহের নিবৃত্তির পথ অন্বেষণ করেন। তাঁহারা কর্ম্মক্ষেত্রে কর্ম্মাশয়ের প্রতিনিবৃত্তি করিয়া নিশ্চিন্তচিত্তে মৃত্যুকে যেন পরম বন্ধুবৎ আলিঙ্গন করিয়া থাকেন। অতএব প্রত্যক্ষ পরিদৃশ্যমান ঘটনা দ্বারাও তমোগুণাচ্ছন্ন মূঢ়গণের বিশ্বাস জন্মে না; কিন্তু সত্ত্বগুণ-প্রধান ব্যক্তিদের বিশ্বাস জন্মিয়া থাকে।

অতএব যাহাতে অন্তঃকরণ সত্ত্বগুণপ্রধান হয়, তদ্বিষয়ে চেষ্টা করাই অগ্রে কর্ত্তব্য। পথ্যাচার পালন করিলেই সেই সত্ত্বগুণের আধিক্য হইবে এবং তখন অন্তঃকরণে যে আনন্দ অনুভূত হইবে, সেই আনন্দই ক্রমশঃ বিশ্বাস ও ভক্তির পথ পরিষ্কার করিয়া দিবে। সুতরাং শ্রদ্ধাহীন ব্যক্তিরা রোগমুক্তির জন্য ঔষধ-সেবন-স্বরূপে পথ্যাচার পালন করিতে আরম্ভ করিলেও শেষে সেই পথ্যাচারই তাহাদের জীবনের পরম শান্তিপ্রদ হইবে। আর পথ্যাচার হইতে পরিভ্রষ্ট হইলেই কষ্টে পতিত হইতে হয়, ইহাও পুনঃ পুনঃ পরীক্ষা করিয়া অবশেষে শ্রদ্ধা বা ভক্তিসহকৃত বিশ্বাস অন্তঃকরণে দৃঢ়তা প্রাপ্ত হইবে।

১২প্র। সত্ত্ব, রজঃ এবং তমঃ, ইহারা কিরূপ পদার্থ? দ্রব্যবাচক পদার্থ, অথবা গুণবাচক পদার্থ?

উ। সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ, ইহারা দ্রব্যবাচক পদার্থ। অর্থাৎ

ইহারাও অতি সূক্ষ্ম জড় পদার্থ। তবে সেই সকল পদার্থের অস্তিত্ব গুণ দ্বারাই অনুভূত হয় বলিয়া তাঁহারা 'গুণ' বলিয়াই সচরাচর কথিত হয়। অর্থাৎ "সত্ত্বগুণ" "রজোগুণ" ও "তমোগুণ" বলিয়া অভিহিত হয়। বস্তুতঃ সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ, ইহারা বায়বায় পদার্থ অপেক্ষাও সূক্ষ্মতর দ্রব্য। সেই সূক্ষ্ম দ্রব্য সকল প্রধানতঃ মস্তিষ্কে বা চিত্তক্ষেত্রে কার্য্যকরী শক্তি বা গুণ প্রকাশ করে।

সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ কিরূপ পদার্থ, তাহা কথঞ্চিৎ বোধগম্য করিবার জন্য একটী সামান্য উদাহরণ দিতেছি,-

সত্ত্ব, নির্ম্মল বায়ুস্বরূপ; রজঃ, ধূলিসমাচ্ছন্ন বায়ুস্বরূপ এবং তমঃ কুজ্ঝটিকাময় বায়ুস্বরূপ। যেমন নির্ম্মল বায়ুতে সূর্য্য-কিরণ প্রতিফলিত হইয়া জগৎ প্রকাশিত করে, তদ্রূপ সত্ত্বযুক্ত অন্তঃকরণে আত্মার জ্যোতিঃ প্রতিফলিত হইয়া জ্ঞান ও আনন্দ প্রকাশ করে।

যেমন ধূলিসমাচ্ছন্ন বা কুয়াসাচ্ছন্ন বায়ুতে প্রকাশস্বরূপ বিশদ সূর্য্যরশ্মি পতিত হইলেও জগৎ অস্পষ্টভাব ধারণ করে, তদ্রূপ রাজসিক ও তামসিক চিত্তে জ্ঞানানন্দস্বরূপ আত্ম-জ্যোতিঃ প্রতিফলিত হইয়াও জ্ঞান ও আনন্দ স্ফূর্ত্তি পায় না। [সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ সম্বন্ধে অন্যান্য কথা যোগসাধন প্রথমভাগে বিস্তৃতরূপেই বলা হইয়াছে]।

১৩প্র। আত্মা জ্ঞানস্বরূপ ও আনন্দ স্বরূপ; আত্মা অতি বিশুদ্ধ, এই সকল কথা আর্য্যশাস্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায়; তবে "আত্মোন্নতি-বিধান" বা "আত্মোৎকর্ষ-সাধন" অথবা "আত্মশুদ্ধি" ইত্যাদি কথার তাৎপর্য্য কি?

উ। "আত্মোন্নতি-বিধান," "আত্মোৎকর্ষ-সাধন" ও "আত্ম-

শুদ্ধি” ইত্যাদি স্থলে “আত্মা” শব্দের অর্থ “উপাধি-সমন্বিত আত্মা,” স্বতন্ত্র “আত্মা” নহে। “নিত্যশুদ্ধ বোধ-স্বরূপ” স্বতন্ত্র আত্মার উন্নতি-বিধান বা উৎকর্ষ-সাধন নিতান্তই অসঙ্গত কথা। “উপাধিসমন্বিত আত্মাই” মন বা চিত্ত বা বুদ্ধি বা অন্তঃকরণ বা জীবাত্মা বলিয়া নিয়ত উক্ত হয়।

অতএব আত্মোৎকর্ষসাধন বা আত্মশুদ্ধি বলিলে চিত্তের উৎকর্ষসাধন ও চিত্তশুদ্ধি বুঝিতে হইবে।

রজঃ ও তমঃ দ্বারা চিত্ত কলুষিত থাকিলে আত্ম-জ্যোতিঃও যেন কলুষিত ভাব ধারণ করে, রজঃ এবং তমঃই চিত্তমল এবং তাহাই চিত্তের ক্লেশপ্রদ। অতএব চিত্ত বা অন্তঃকরণ যাহাতে রজঃ ও তমঃ দ্বারা আচ্ছন্ন না হয়, তদ্বিষয়ে চেষ্টা করিলেই আত্মোন্নতি সাধন বা আত্মশুদ্ধি করা হয়।

ফলতঃ উপাধির শোধন বা চিত্তমল পরিষ্কার করার নামই “আত্মশোধন”।

১৪ প্র। ভগবন্! পঞ্চক্লেশের বিষয় জানিতে ইচ্ছা করি।

উ। অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ এবং অভিনিবেশ এই পাঁচটী ক্লেশ বলিয়া কথিত।

অবিদ্যা।

যাহা অনিত্য তাহাকে নিত্য জ্ঞান করা, যাহা অশুচি তাহাকে শুচি জ্ঞান করা, যাহা দুঃখ তাহাকে সুখ মনে করা, এবং যাহা অনাত্মা তাহাকে আত্মা মনে করাই

অবিদ্যা। মোহ, মায়া, অজ্ঞানতা প্রভৃতিও এই অবিদ্যারই নামান্তর।

এই যে গৃহটী দেখিতেছ, ইহা পূর্ব্বে ছিল না, পরেও থাকিবে না, মধ্যে কিছুকালের জন্য আছে মাত্র, অতএব ইহা অনিত্য; কিন্তু মোহাচ্ছন্ন ব্যক্তিরা স্ব স্ব গৃহকে নিত্য বলিয়া মনে করে। গৃহের কথা দূরে থাক্, ভূধর, সাগর, নদ, হ্রদ, অরণ্য, জনপদ কিছুই নিত্য নহে, সকলই অনিত্য; অধিক কি এই পৃথিবীও অনিত্য। কিন্তু লোকে মায়া বা অবিদ্যা বশেই এই সকলকে নিত্য মনে করে। এবং তদ্রূপ মনে করিয়া নানা প্রকার ক্লেশ সহ্য করে।

কাহারও পিতা, মাতা, ভ্রাতা, ভগ্নী, স্ত্রী, পুত্র, কন্যা ও অন্যান্য আত্মীয় বন্ধু বান্ধবগণের সহিত পূর্ব্বে সম্বন্ধ ছিল না, পরেও সম্বন্ধ থাকিবে না, মধ্যে কিছুকালের জন্য সম্বন্ধ ঘটিয়াছে মাত্র; অতএব এই সকলই অনিত্য। কত জন্ম-জন্মান্তরে এইরূপ কত সম্বন্ধ ঘটনা হইবে, এই সম্বন্ধের স্থিরতা নাই, কিন্তু মায়া বা অবিদ্যা হেতুই লোকে এই সকল সম্বন্ধ নিত্য মনে করিয়া কতই ক্লেশ সহ্য করে।

এইরূপ রাজ্যসম্পত্তি বা ধনৈশ্বর্য্য প্রভৃতিও অনিত্য; কিন্তু অবিদ্যাবশে লোকে তাহাদিগকে নিত্য মনে করিয়া কতই লঙ্কাকাণ্ড ও কুরুক্ষেত্র সমরের ন্যায় অভিনয় করে এবং কতই উদ্বেগ ও ক্লেশ সহ্য করে।

শরীর, রূপ ও যৌবন প্রভৃতি নিতান্ত নশ্বর, তথাপি

লোকে মোহবশতঃ তাহাদিগকে নিত্য মনে করিয়া থাকে। এবং তজ্জন্য নিরন্তর ক্লেশ ভোগ করে।

শরীর মলমূত্ররক্তমাংসমজ্জা প্রভৃতি অতি ঘৃণিত পদার্থ দ্বারা নির্ম্মিত; কিন্তু এই অশুচি শরীরকেও লোকে মোহবশতঃ শুচি মনে করিয়া থাকে।

প্রকৃতপ্রস্তাবে মনুষ্যজীবন দুঃখময়; কিন্তু ক্ষণিক দুঃখনিবৃত্তিকে লোকে সুখ মনে করে। স্ত্রীপুত্রাদি অশেষ ক্লেশের হেতু হইলেও লোকে মোহবশতঃ সেই স্ত্রী-পুত্রাদিকে সুখদায়ক মনে করে। স্ত্রীপুত্রাদির ভরণ-পোষণের জন্য লোকে অশেষ ক্লেশ সহ্য করে, তাহাদের পীড়া হইলে উদ্বেগজনিত ক্লেশে অস্থির হয় এবং তাহা-দের মৃত্যু হইলে শোকে অভিভূত হয়। তথাপি দুঃখপ্রদ এই সকল সংসারবন্ধনকে লোকে মোহবশতঃ সুখ মনে করে। ক্ষুধা হইলেই সেই ক্ষুধা নিবৃত্তির জন্য লোকে আহার গ্রহণার্থ ব্যস্ত হয়; কিন্তু যথাসময়ে ক্ষুধা না হইলেও লোকে উদ্বেগগ্রস্ত হয়। সুতরাং ক্ষুধারূপ দুঃখপ্রদ ব্যাধিকেও লোকে সুখজনক মনে করে।

সময় গত হইলেই আয়ুঃক্ষয় হইতে থাকে এবং শরীর জীর্ণ হইয়া মৃত্যুর সন্নিহিত হয়; কিন্তু তথাপি লোকে মোহবশতঃ "ভবিষ্যতে সুখী হইব" এই ভ্রান্ত আশার বশীভূত হইয়া সময়ক্ষেপ করে; অথচ জীবনের কোন সময়েই অভিলষিত সুখের দর্শন পায় না। সুখ যে কিরূপ পদার্থ তদ্বিষয়ে মোহান্ধ মানবগণের বোধ নাই, তথাপি সুখের প্রত্যাশাতেই জীবনক্ষয় করে এবং অশেষ দুঃখ

সহ্য করে। ফলতঃ এ সংসারে মোহান্ধ মানবের সুখের সম্ভাবনা নাই, কেবল সুখের আশাতেই তাহারা দুঃখের জীবন অতিবাহিত করে।

মোহবশতঃ লোকে জড় শরীরকেই আত্মা মনে করে। অথচ সকলেই বলে "আমার শরীর।" এস্থলে মোহবশতঃ "আমার" এই সম্বন্ধপদের অর্থ বুঝিতে পারে না।

স্থূলদেহের অভ্যন্তরে সূক্ষ্মদেহ আছে, সেই সূক্ষ্মদেহেরও অভ্যন্তরে পরম পরিশুদ্ধ আত্মা আছেন, এ কথা অবোধ মানবের বুদ্ধির অতীত।

প্রকৃত আত্মজ্ঞানের অভাবেই লোকে "আমার দেহ" "আমার পুত্র" "আমার ধন" ইত্যাদি রূপ মায়ার অধীন হইয়া ক্লেশভোগ করে। কিছুদিনের জন্যই যে এই সকলের সহিত সম্বন্ধ, এ সকল যে আত্মা হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন পদার্থ, লোকে মোহবশে ইহা বুঝিতেও পারে না। সেই জন্যই শরীর ও পুত্রধনাদির বিনাশে লোকে "সর্ব্বনাশ" মনে করে।

অস্মিতা।

অন্তঃকরণ বা মন বা বুদ্ধিও সূক্ষ্ম জড়পদার্থ; সুতরাং তাহাও আত্মা নহে; কিন্তু তাহাকে আত্মা বলিয়া বোধ করার নাম অস্মিতা। ইহাও অবিদ্যা-প্রসূত অনাত্মজ্ঞানেরই বিশেষ স্থলমাত্র। আত্মা চৈতন্যস্বরূপ বা জ্ঞানস্বরূপ; উহা অন্তঃকরণে প্রতিফলিত হওয়াতেই জড় অন্তঃকরণ মনন বা চিন্তা করিতে এবং বিবিধ সঙ্কল্প করিতে সমর্থ হয়।

ফলতঃ সূর্য্যরশ্মি দ্বারা যেমন জগতে বর্ণ-বৈচিত্র্য ঘটিয়াছে অর্থাৎ নানা বর্ণের নানা বস্তু শোভা পাইতেছে, তদ্রূপ আত্মজ্যোতিঃ দ্বারা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে জীব-বৈচিত্র্য ঘটিয়াছে অর্থাৎ নানা জীবের নানাপ্রকার গতিবিধি দৃষ্ট হইতেছে। তবে প্রদীপের আলোকে যেমন সামান্য একটী গৃহ আলোকিত করে, তদ্রূপ সূর্য্যও একটী সামান্য সৌর জগৎ বিভাসিত করে, কিন্তু আত্মজ্যোতিঃ অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিয়া আছেন। সেই আত্মজ্যোতিঃ চক্ষুর অদৃশ্য, মনেরও অগম্য। কিন্তু সেই আত্মজ্যোতিঃ বিভিন্ন উপাধিতে প্রতিফলিত হওয়াতেই বিভিন্ন জীবের উদ্ভব হইয়াছে। যেমন স্বচ্ছ স্থির জলে সূর্য্য-প্রতিবিম্ব অবিকল প্রতিফলিত হয়, কিন্তু আবিল ও চঞ্চল জলে সেই প্রতিবিম্ব সুস্পষ্ট প্রতিফলিত হয় না, তদ্রূপ বিশুদ্ধ-সত্ত্ব সমাহিত যোগীর চিত্তে সেই আত্মজ্যোতিঃ সুস্পষ্ট অনুভূত হইয়া থাকে। কিন্তু অন্যান্য ইতর মনুষ্যের বা ইতর জীবের রজস্তমোময় আবিল ও চঞ্চল অন্তঃকরণে সেই আত্মজ্যোতিঃ অনুভূত হয় না। সেই অনুভূতির অভাবেই সামান্য লোকে আত্মজ্ঞানে বঞ্চিত থাকে এবং অনাত্ম বস্তুকেই আত্মা বলিয়া মনে করে।

ফলতঃ অন্তঃকরণ বা চিত্ত বিশুদ্ধ সত্ত্বপ্রধান হইলেই জ্ঞানময় ও আনন্দময় হইয়া থাকে এবং সেই অন্তঃকরণই আত্মজ্যোতিঃ অনুভব করিতে সমর্থ হয়; নতুবা রজস্তমঃ দ্বারা সমাচ্ছন্ন, কলুষিত ও চঞ্চল চিত্ত সেই আত্মজ্যোতিঃ অনুভব করিতে সমর্থ হয় না। তজ্জন্যই রাজসিক ও

তামসিক মানবগণ মোহাভিভূত হইয়া বিবিধ ক্লেশপ্রদ বাসনা বা সঙ্কল্প করে এবং সেই সঙ্কল্পবশেই অবিরত জন্মজরামরণ ক্লেশ ভোগ করে।

রাগ ও দ্বেষ।

আত্মজ্ঞানের অভাব হেতুই লোকে কোন কোন বস্তুকে বা ব্যক্তিকে ভালবাসে এবং কোন কোন বস্তুকে বা ব্যক্তিকে ভালবাসে না। এই অনুরাগ ও বিরাগ বশতঃ মোহাচ্ছন্ন ব্যক্তিরা অশেষ ক্লেশভোগ করিয়া থাকে। এই অবিদ্যাসম্ভূত রাগ এবং দ্বেষের জন্যই লোকে কাহাকেও আত্মীয় মনে করিয়া তাহার জন্য প্রাণপণ করে, আবার কাহাকেও শত্রু মনে করিয়া তাহার বিনাশসাধনে যত্ন করে। এই রাগদ্বেষ যে নিতান্ত অস্থির তাহাও মোহান্ধতা বশতঃ লোকে বুঝিতে পারে না। আজ যাহাকে লোকে পরম আত্মীয় বলিয়া বোধ করে, কল্য হয় ত গুটিকত কটুকথার জন্য সেই আত্মীয় শত্রু বলিয়া গণ্য হইবে। আজ যে শত্রু আছে, কল্য হয়ত কিছু উপকার সাধনের জন্য সেই শত্রুই মিত্র বলিয়া গণ্য হইবে। লোকে যে শরীরকে পরমযত্নে রক্ষা করে, ব্যাধি-যন্ত্রণা ও অপমান প্রভৃতি কারণে সেই শরীর হইতে প্রাণ বিযুক্ত করিয়া "আত্মহত্যা" করে। যে স্ত্রীপুত্রাদির জন্য লোকে প্রাণ বিসর্জ্জন করিতেও কুণ্ঠিত হয় না, সামান্য কারণে— কয়েকটী কটুকথার জন্য বা বিশ্বাসঘাতকতার জন্য বা

অনুরাগের অভাব জন্য লোকে সেই স্ত্রীপুত্রাদিও বিসর্জ্জন করে। অতএব রাগ ও দ্বেষ নিতান্তই অস্থির বা অনিত্য; অথচ রাগদ্বেষ মায়াবদ্ধ অজ্ঞান লোকদিগকে অশেষ ক্লেশ প্রদান করে।

অভিনিবেশ।

জীব বাসনাবশে পুনঃপুনঃ জন্মগ্রহণ করিয়া পুনঃপুনঃ মৃত্যুগ্রস্ত হয়; মৃত্যুই ক্লেশের চূড়ান্তস্বরূপ; এই দুঃসহ মৃত্যুযন্ত্রণা পুনঃপুনঃ ভোগ করাতে জীবমাত্রেই মৃত্যু-ভয়ে সতত ভীত; অধিক কি, সদ্যোজাত জীবও মৃত্যু-ভয়ে চমকাইয়া উঠে। এই মৃত্যুভয়ে অজ্ঞান ব্যক্তিরা আজীবন ভীত হইয়া অশেষ ক্লেশপ্রদ উদ্বেগ সহকারে কালক্ষেপ করে; কিন্তু মৃত্যু একদিন উপস্থিত হইবেই হইবে। যিনি যতই সতর্ক থাকুন, যিনি যতই চেষ্টা করুন, যত দিন আত্মজ্ঞান না জন্মিবে, ততদিন তাঁহাকে নিরন্তর মৃত্যুভয়ে ব্যতিব্যস্ত থাকিতেই হইবে, ইহা অপেক্ষা ক্লেশ-প্রদ আর কি আছে?

১৫প্র। কিন্তু ভগবন্, বেদান্তবিৎ মহাপণ্ডিতদিগকেও উক্ত মায়ার বশে ক্লেশ ভোগ করিতে দেখা যায়। অধুনা অনেকে পরমহংস হইয়াও সাংসারিক খ্যাতিপ্রতিপত্তি লাভে লালায়িত; সামাজিক উন্নতিবিধানে বিব্রত। তাঁহারা আত্মজ্ঞান লাভ করিয়াও কেন সংসারে লিপ্ত থাকিয়া সাংসারিক ইতর-সাধারণের মত কার্য্য করেন? তাঁহারা আত্মজ্ঞান লাভ করিয়াও কেন বাসনা পরিত্যাগ করেন না?

উ। আত্মা কিরূপ, তাহা জানিলেই আত্মজ্ঞান লাভ করা

যায় না। আত্মা কিরূপ, তাহা বিশুদ্ধ অন্তঃকরণে অনু-ভব করিলেই আত্মজ্ঞান লাভ করা হয়।

ফলতঃ "আত্মা অচ্ছেদ্য, অভেদ্য, অদাহ্য, অনন্ত, জ্ঞানময়, আনন্দময়, সৎস্বরূপ, বিশ্বব্যাপী।" এবং "আত্মা ইহা নহে, উহা নহে, তাহা নহে" এবম্প্রকার জ্ঞান লাভ করিলেই প্রকৃত আত্মজ্ঞান লাভ করা হয় না। বাসনা-কলুষিত রাজসিক চিত্তে আত্মানুভূতির সম্ভাবনাও নাই। অতএব বেদান্তশাস্ত্রে জ্ঞানলাভ করিলেই আত্মজ্ঞান জন্মে না এবং পরমহংস উপাধি লাভ করিলেও আত্মজ্ঞান জন্মে না। তবে অবশ্য বেদান্তজ্ঞান আত্মজ্ঞানের সহায় বটে; কিন্তু যাহারা শৌচসাধন বা ক্রিয়াযোগ দ্বারা চিত্তবৃত্তি পরিশুদ্ধ না করিয়া বেদান্তজ্ঞান লাভ করে অথবা যাহারা বেদান্তজ্ঞান লাভ করিয়াও চিত্তশুদ্ধির জন্য ক্রিয়াযোগ অবলম্বন না করে, তাহারা কখনই প্রকৃত আত্মজ্ঞান লাভ করিতে পারে না; সুতরাং তাহাদের পক্ষে ইতর-সাধারণের মত সাংসারিক বাসনাবশে কার্য্য করাই সম্ভব।

১৬প্র। দেব, তবে বেদবেদান্ত পাঠ করিবার প্রয়োজন কি? শৌচসাধন বা ক্রিয়াযোগই যদি চিত্তশুদ্ধির হেতু হয় এবং চিত্তশুদ্ধিই যদি আত্মজ্ঞানের বা আত্মানুভূতির সহায় হয়, তবে বেদবেদান্ত পাঠ না করিয়া ক্রিয়াযোগ অবলম্বন করাই ত শ্রেয়ঃ।

উ। তপস্যা, বেদান্তপাঠ এবং ঈশ্বর-প্রণিধান এই তিনই ক্রিয়াযোগের অন্তর্গত। ইহার কোনটী পরিত্যাগ করি-লেই ক্রিয়াযোগ সাধন করা হয় না, এবং চিত্তশুদ্ধিও হয় না। ফলতঃ তপস্যাবিহীন বৈদান্তিক পণ্ডিত, বেদান্ত-

জ্ঞানহীন তপস্বী, জ্ঞানবিহীন ঈশ্বরভক্ত, অথবা ভক্তিবিহীন জ্ঞানী, ইহারা সকলেই, অন্ধ বা পঙ্গুর ন্যায় মুক্তিপথের অযোগ্য।

বেদান্তাদি শাস্ত্রজ্ঞান না জন্মিলে বিবেচনা বা বিচার-ক্ষমতা জন্মে না ; বিবেচনা না জন্মিলে বৈরাগ্য জন্মে না; বৈরাগ্য না জন্মিলেও তপস্যা ও ঈশ্বর-প্রণিধানে শ্রদ্ধা জন্মিতে পারে না। অতএব বেদবেদান্তজ্ঞান আত্মজ্ঞান লাভের জন্য নিতান্ত আবশ্যক।

১৭ প্র। কিন্তু ভগবন্, বেদান্তজ্ঞানে অনেকেই নাস্তিকবৎ অথবা নাস্তিক অপেক্ষাও অধিকতর পাষণ্ড হইয়া থাকে। তাহারা "সোঽহং অর্থাৎ আমিই সেই পরমাত্মা ; সুতরাং আমি সহজেই শুদ্ধ বা অপাপবিদ্ধ ; আমাকে কখনই পাপ স্পর্শ করিতে পারে না; আমি যাহাই করি না কেন, তাহাতে আমার কোন পাপই হইতে পারে না।" এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া সর্ব্ব প্রকার পাপাচরণই করিয়া থাকে। অতএব বোধ করি এরূপ শাস্ত্রজ্ঞানের অপেক্ষা অজ্ঞতা বরং শ্রেয়ঃ।

উ। কিন্তু বৎস, পাপাচরণ করিয়া কেহই দুঃখের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পায় না। যে কার্য্য দুঃখপ্রদ, তাহারই নাম পাপ, আর যে কার্য্য সুখপ্রদ, তাহারই নাম পুণ্য। যিনি সুখদুঃখের অতীত, অর্থাৎ যিনি দুঃখে ক্লিষ্ট বা সুখে হৃষ্ট হন না, তিনিই পাপপুণ্যের অতীত ; অর্থাৎ তাঁহারই কোন কার্য্যে পাপ বা পুণ্য হয় না। তিনিই "সোঽহং" বলিলে অসঙ্গত হয় না। কিন্তু যিনি স্বীয় পদে একটী সামান্য কণ্টক বিদ্ধ হইলেই যাতনায় অস্থির হন, যাঁহার সুখদুঃখবোধ আছে, যিনি দুঃখপরিহারের জন্য এবং সুখলাভের জন্য সাংসারিক কার্য্যে লিপ্ত, তিনি

যদি আপনাকে পাপপুণ্যের অতীত মনে করেন, তবে শাস্ত্রজ্ঞান তাঁহার উপকার না করিয়া অপকারই করে। সংসারে এরূপ পণ্ডিতমূর্খের অভাব নাই, একথা সত্য বটে; কিন্তু তজ্জন্য বেদ-বেদান্ত নিন্দার্হ নহে।

এ সংসারে বিষয়বাসনার পরিণাম কিরূপ, সসাগরা ধরণীর অধিপতিগণেরও পরিণাম কিরূপ, তাহাই প্রদর্শন করিয়া লোকের বিষয়-বৈরাগ্য উৎপাদন করিবার জন্যই রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি পুরাণ প্রণীত ও প্রচারিত হইয়াছে। এতদ্দ্বারা এই আর্য্যস্থানে জনসাধারণের পক্ষেও মুক্তির পথ সরল হইয়াছে। কিন্তু ইন্দ্রিয়পরায়ণা কোন রমণী মহাভারত শ্রবণ করিয়া যদি সিদ্ধান্ত করে যে, "স্ত্রীলোকের পক্ষে পাঁচটী স্বামীও দোষাবহ নহে" তাহা হইলে যেমন মহাভারত দূষ্য হয় না, তদ্রূপ বেদান্ত পাঠ করিয়া যদি কোন বিষয়-বিমূঢ় বা পণ্ডিত-মূর্খ সিদ্ধান্ত করে যে, "আত্মা শুদ্ধ ও অপাপবিদ্ধ, এবং আমি সেই আত্মা, সুতরাং আমি বেশ্যাগমনই করি, অথবা সুরাপানই করি, তাহাতে আমার কোন পাপ হইবে না।" তাহা হইলেও বেদান্ত কখনও দূষ্য হইবে না।

সংসারে সাধারণতঃ ব্যক্তিমাত্রেই সুখের অভিলাষ করে; কেহই দুঃখভোগ করিতে ইচ্ছা করে না। কিন্তু মূর্খেরা আপাততঃ ক্ষণিক সুখে মুগ্ধ হইয়া পরিণামে বিস্তর ক্লেশ ভোগ করে, আর যথার্থ পণ্ডিতেরা পরিণামের সুখের জন্য আপাত-প্রলোভন পরিত্যাগ করেন। মূর্খে ও পণ্ডিতে এইমাত্র প্রভেদ। কিন্তু শাস্ত্রজ্ঞানাদি

লাভ করিয়াও যাহারা আপাত-প্রলোভনের ক্ষণিকসুখে মুগ্ধ হইয়া পড়ে, তাঁহারাও অবশ্য মূর্খেরই দলভুক্ত এবং তাহাদিগকেই 'পণ্ডিতমূর্খ' বলা যায়। তবে সামান্য মূর্খের অপেক্ষাও পণ্ডিতমূর্খের একটু উৎকর্ষ স্বীকার করা আবশ্যক। শাস্ত্রজ্ঞানাদিবিহীন সামান্য মূর্খেরা সহস্র-বার দুঃখভোগ করিয়াও দুঃখের হেতু অবধারণ করিতে পারে না; সুতরাং আজীবন পাপাচরণ করিয়া কেবল দুঃখরূপ নরকভোগ করিয়াই মৃত্যুগ্রস্ত হয়। কিন্তু পণ্ডিতমূর্খেরা আপাত-প্রলোভনের বশীভূত হইয়া দুষ্কার্য্য বা পাপ করিলেও দুঃখভোগের সময় তাঁহার হেতু বা নিদান বিবেচনা করিয়া অবধারণ করিতে পারে এবং "ভবিষ্যতে আর প্রলোভনের বশে পাপ করিব না" এরূপ সঙ্কল্পও করে। আর এইরূপ সঙ্কল্প বা প্রতিজ্ঞা দুই চারি বার ভঙ্গ করিলেও পরে সেই সঙ্কল্প রক্ষা করিতেও সমর্থ হয়।

অতএব শাস্ত্রাধ্যয়নের ফল কখনও বিফলও হয় না। শাস্ত্রজ্ঞান কোন না কোন সময়েও অজ্ঞানতার নিবারণ করে।

বৎস, কাহাকেও পাপকার্য্য করিতে দেখিলে বিস্মিত বা ক্রুদ্ধ হইও না। পাপীরা করুণার্হ। অজ্ঞান মূর্খেরা ত পাপ করিবেই; কিন্তু পণ্ডিতেরাও যে পাপ করেন, তাহাতেও বিস্ময়ের বিষয় নাই। অর্জ্জুন স্বীয় সারথি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "হে কৃষ্ণ! পুরুষ পাপাচরণে ইচ্ছা না করিলেও কে তাহাকে বল-

পূর্ব্বক পাপে আসক্ত করায় ?” অর্জ্জুনবাক্যের প্রত্যুত্তরে ভগবান্ বলিয়াছেন,—

“কাম এষ ক্রোধ এষ রজোগুণসমুদ্ভবঃ।
মহাশনো মহাপাপ্মা বিদ্ধ্যেনমিহবৈরিণম্॥
ধূমেনাব্রিয়তে বহ্নির্যথা দর্শো মলেন চ।
যথোল্বেনাবৃতো গর্ভস্তথা তেনেদমাবৃতম্॥
আবৃতং জ্ঞানমেতেন জ্ঞানিনো নিত্যবৈরিণা।
কামরূপেণ কৌন্তেয় দুষ্পূরেণানলেন চ॥
ইন্দ্রিয়াণি মনোবুদ্ধিরস্যাধিষ্ঠানমুচ্যতে।
এতৈর্বিমোহয়ত্যেষ জ্ঞানমাবৃত্য দেহিনাম্॥
তস্মাত্ত্বমিন্দ্রিয়াণ্যাদৌ নিয়ম্য ভবতর্ষভ।
পাপ্মানং প্রজহি হ্যেনং জ্ঞানবিজ্ঞাননাশনম্॥
ইন্দ্রিয়াণি পরাণ্যাহুরিন্দ্রিয়েভ্যঃ পরং মনঃ।
মনসস্তু পরা বুদ্ধির্যো বুদ্ধেঃ পরতস্তু সঃ॥
এবং বুদ্ধেঃ পরং বুদ্ধা সংস্তভ্যাত্মানমাত্মনা।
জহি শত্রুং মহাবাহো কামরূপং দুরাসদম্॥”

অর্থাৎ “রজোগুণসম্ভূত কাম এবং ক্রোধই পুরুষকে (জীবাত্মাকে) পাপে আসক্ত করে। এই কাম-ক্রোধ অতীব দুষ্পূরণীয় এবং অতীব উগ্র। ইহারাই মনুষ্যের ঘোর শত্রু। যেমন ধূম অগ্নিকে, ধূলি বা মল দর্পণকে এবং জরায়ুচর্ম্ম গর্ভকে আচ্ছন্ন করে, তদ্রূপ রজঃসম্ভূত কাম জ্ঞানকে আচ্ছন্ন করে। চক্ষুকর্ণাদি বহিরিন্দ্রিয় এবং মন ও বুদ্ধিরূপ অন্তরিন্দ্রিয় কামের অধিষ্ঠান ভূমি।

কাম সেই ইন্দ্রিয়গণ দ্বারাই জ্ঞানকে আবৃত রাখিয়া দেহাভিমানী জীবকে মোহাভিভূত করে।

অতএব হে অর্জ্জুন, তুমি অগ্রে ইন্দ্রিয় সকলকে বশীভূত করিয়া সর্ব্ব পাপের, সুতরাং সর্ব্বদুঃখের হেতুস্বরূপ এবং জ্ঞান ও বিজ্ঞানের (আত্মানুভূতির) বিনাশকারী কামকে বিনষ্ট কর।

স্থূলদেহ অপেক্ষা ইন্দ্রিয়গণ শ্রেষ্ঠ; ইন্দ্রিয় অপেক্ষা মন ও মন অপেক্ষা বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ। বুদ্ধি অপেক্ষাও যিনি শ্রেষ্ঠ তিনিই আত্মা। হে বীরশ্রেষ্ঠ অর্জ্জুন, তুমি সেই বুদ্ধি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আত্মাকে বিদিত হইয়া সঙ্কল্পাত্মিকা বুদ্ধি দ্বারা মনের স্থৈর্য্যসাধন করতঃ সেই কামরূপ দুর্জ্জয় শত্রুর বিনাশ কর।"

রজোরূপ চিত্তমল দূরীকরণে যত্নবান্ না হইলেই জ্ঞানীরও জ্ঞান কাম দ্বারা আচ্ছন্ন হইয়া থাকে। সেই জন্যই শাস্ত্রজ্ঞান-সম্পন্ন জ্ঞানীদিগকেও পাপে আসক্ত দেখা যায়।

অতএব জ্ঞান লাভ করিয়াও তপঃসাধন দ্বারা—অর্থাৎ শৌচ, মিতাহার ও ব্রহ্মচর্য্য প্রভৃতি পশ্বাচার দ্বারা চিত্তমল দূর করা কর্ত্তব্য। সত্ত্বগুণের বৃদ্ধি করিতে না পারিলে রাজসিক চাঞ্চল্য এবং তামসিক মূঢ়তা নিশ্চয়ই পাপে আসক্তি জন্মাইবে।

প্র। ভগবন্, জীবিত মনুষ্য কি কখনও সুখদুঃখের অতীত অবস্থা প্রাপ্ত হইতে পারে?

উ। পারে। সর্ব্বদাই দেখা যায়, মানুষ যখন রোগশোক-

ভয়াদিবশতঃ বা মাদক দ্রব্যের শক্তি বশতঃ মূর্চ্ছিত হয়, তখন সজীব থাকিলেও সুখদুঃখ বোধ করিতে পারে না। অস্ত্রচিকিৎসকেরা কোন রোগীর কোন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ছেদন করা আবশ্যক মনে করিলে, তাহাকে মেস্‌মেরিজম্‌ বা ক্লোরোফরম্‌ দ্বারা অগ্রে মূর্চ্ছিত করিয়া পরে অস্ত্রপ্রয়োগ করেন। সেই মূর্চ্ছিত অবস্থাতে রোগী সজীব থাকিলেও কিছুমাত্র দুঃখ অনুভব করিতে পারে না।

কিন্তু এই মূর্চ্ছা স্বাভাবিক বা কৃত্রিম রোগবিশেষ। এই অবস্থায় বুদ্ধি সম্পূর্ণ অভিভূত হইয়া পড়ে। তমোগুণের আধিক্যেই এই মূর্চ্ছা হয়। সুতরাং এই তামসিক মূর্চ্ছা মুক্তিপ্রদ নহে।

যখন মনে সত্ত্বগুণের আধিক্য হয়, তখন যোগসাধন দ্বারা সহজেই তাহাকে একাগ্র করা যায়। মনের সেই একাগ্র অবস্থাকে সমাধি বলে। সেই সমাধি সময়েও মানুষ সুখদুঃখের অতীত অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। এই সমাধি যথার্থ মুক্তি বলিয়া অভিহিত হইতে পারে।

প্র। তবে কি যোগীরা শারীরিক ব্যাধিজন্য অথবা শারীরিক কোন আঘাতজন্য বেদনা অনুভব করেন না ?

উ। রক্তমাংসময় সজীব দেহ পীড়িত বা আহত হইলেই সকলেই ক্লেশ অনুভব করে। কিন্তু যোগীরা ইচ্ছামাত্রেই সেই মনকে ক্লেশ-ভাবনা হইতে অন্য কোন সুখদ ভাবনায় অথবা সুখদুঃখের অতীত নির্ব্বিকল্প কোন অবস্থায় নীত করিয়া তৎক্ষণাৎ ক্লেশমুক্ত হইতে পারেন। ফলতঃ যাঁহারা প্রত্যাহার অভ্যাস করিয়া মনের উপর

আধিপত্য লাভ করিয়াছেন—মনকে যাঁহারা স্বেচ্ছানুসারে নিয়োজিত করিতে পারেন, তাঁহারাই সুখদুঃখের অতীত।

সামান্য দৃষ্টান্ত দ্বারাও এ কথা বুঝিতে পার ; যাহারা পাশা বা দাবা খেলিতে অত্যন্ত ভালবাসে, তাহারাও সেই পাশা বা দাবা খেলিবার সময় একাগ্রচিত্ত হইয়া ব্যাধি-যন্ত্রণা বা শোকযন্ত্রণা অন্ততঃ কিছুক্ষণের জন্যও নিবারণ করিতে পারে। কিন্তু এই ক্রীড়াজন্য মনোযোগ যতই প্রগাঢ় হউক্, তথাপি তাহা তামসিক ও ক্ষণিকমাত্র।

মন সাত্বিকভাবাপন্ন হইলে তাহাকে যদি একাগ্র করা যায়, তবে সেই একাগ্রতা বহুকাল স্থির রাখা যাইতে পারে। অতএব সত্বগুণপ্রধান ব্যক্তিরাই সহজে জীবন্মুক্তি লাভ করিয়া থাকেন। তাঁহারা দৈহিক বা মানসিক কোন প্রকার দুঃখেই অভিভূত হন না। ইচ্ছামাত্রেই তাঁহারা দুঃখকে দূর করিতে পারেন।

পৌরাণিক্ প্রহ্লাদের নির্য্যাতনের উদাহরণ আর কি দিব, অল্পদিনের কথা বলিতেছি, কোন দুর্দ্দান্ত নবাব সাধু হরিদাসকে বাইশ বাজারে অবিরত বেত্রাহত করিয়াও কিছুমাত্র ক্লিষ্ট করিতে পারে নাই। এই সাধু হরিদাসের মত কত শত মহাত্মা এই সংসারে অক্ষুণ্ণচিত্তে অশেষ নির্য্যাতন সহ্য করিয়াছেন ও করিতেছেন।

অতএব মনের সত্ত্বগুণ বৰ্দ্ধিত করিতে পারিলেই যাবতীয় দুঃখ হইতে সহজেই মুক্তিলাভ করিতে

পারা যায়, এবং পথ্যাচার দ্বারাই সেই সত্ত্বগুণের বৃদ্ধি হয়, ইহা স্মরণ রাখিও।

যাঁহারা শৌচ, মিতাহার ও ব্রহ্মচর্য্য-পরায়ণ, তাঁহারা শারীরিক প্রায় কোন প্রকার ব্যাধি দ্বারাই আক্রান্ত হন না; তবে যদি কখনও আকস্মিক কোন প্রাকৃতিক বা দৈব ঘটনা দ্বারা তাঁহাদের শরীর আহত বা পীড়িত হয়, তাহা হইলেও তাঁহারা স্বীয় সাত্ত্বিক মনকে একাগ্র করিয়া অবলীলাক্রমে সেই ক্লেশ দূরীভূত করিতে পারেন।

আয়ুর্ব্বেদে যে বিস্তর ব্যাধির উল্লেখ আছে, তাহার অধিকাংশ ব্যাধিরই নিদান লোভ এবং কাম। সুতরাং লোভী ও কামুক ইতরসাধারণে যে সকল রোগে পীড়িত হয়, মিতাহারী ব্রহ্মচারীর পক্ষে সেই সকল রোগভোগের সম্ভাবনাই নাই। রোগযন্ত্রণাই শাস্ত্রে নরকযন্ত্রণা বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে; পাপীরাই সেই নরক-যন্ত্রণা ভোগ করে। সত্ত্বগুণসম্পন্ন পুণ্যবান্ ব্যক্তিরা শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যরূপ আনন্দময় স্বর্গভোগ করিয়া থাকেন। তথাপি তাঁহারা স্বীয় শরীরকে হেয় বলিয়াই জানেন; শরীরের প্রতি তাঁহাদের সহানুভূতি নাই; আর সহানুভূতি নাই বলিয়াই আকস্মিক প্রাকৃতিক কোন কারণে শরীর ক্লিষ্ট হইলেও তাঁহারা ক্লেশবোধ করেন না। তজ্জন্যই তাঁহারা শীত, বাত, বর্ষা, আতপ সমভাবে সহ্য করিতে পারেন। ফলতঃ দেহের প্রতি যাহাদের অত্যন্ত মমতা আছে, তাহাদেরই পক্ষে দৈহিক ক্লেশ অসহ্য হইয়া থাকে। কিন্তু যাহাদের শরীরের প্রতি মমতা নাই,

তাহারা আবশ্যক বোধ করিলে স্বীয় শরীরকে অগ্নিতে দগ্ধ করিয়াও ক্লেশ অনুভব করেন না। এই জন্যই পূর্ব্ব-কালে পতিব্রতা সতীরা স্বামীর চিতায় স্বদেহ ভস্মীভূত করিতেন। সেই সত্ত্বগুণপ্রধান সতীরা প্রাণময় কোষ হইতে অন্নময় কোষকে (স্থূলদেহকে) পৃথক্ বলিয়া বিশ্বাস করিতেন এবং প্রাণতুল্য পতির বিয়োগে তাঁহারা স্ব স্ব প্রাণকেও সেই অন্নময় কোষ হইতে বিচ্ছিন্ন বলিয়া অনুভবও করিতেন। সুতরাং বিচ্ছিন্ন অঙ্গ অগ্নিতে দগ্ধ করিলে যেমন কেহই দাহজন্য ক্লেশ অনুভব করে না, তদ্রূপ তাঁহারাও প্রাণ-বিচ্ছিন্ন মৃতবৎ শরীর দগ্ধ করিয়া ক্লেশানুভব করিতেন না।

ফলতঃ দেহের প্রতি যখন মমতা না থাকে, তখন দৈহিক ক্লেশ অনুভূত হয় না। যখন ঘোরতর পাপীরা নরকযন্ত্রণা অসহ্য বোধ করে, তখন তাহারাও স্বীয় দেহের প্রতি মমতা পরিত্যাগ করিয়া আত্মহত্যা করিয়া থাকে। অত্যন্ত ক্রোধ বা অত্যন্ত শোক উপস্থিত হইয়া যখন অন্তঃকরণ অভিভূত হয়, তখনও লোকে দৈহিক ক্লেশ অনুভব করিতে পারে না।

এই সকল পর্য্যালোচনা করিলেই বুঝিতে পারিবে যে, সংসার-বিরাগী দেহের প্রতি মমতাহীন সত্ত্বগুণপ্রধান যোগীরা শরীরের ক্ষতিবৃদ্ধির জন্য কিছুমাত্র ক্লিষ্ট বা হৃষ্ট হন না। অধিক আর কি বলিব, যোগসিদ্ধ মহা-পুরুষ স্বেচ্ছাক্রমে স্বীয় স্থূলদেহ পরিত্যাগ করিতে পারেন। স্বেচ্ছাক্রমে তাঁহারা সূক্ষ্মদেহে পরকায় প্রবেশ

করিতেও পারেন ; তাঁহারা স্থূলশরীরের আধিব্যাধি জন্য কখনই দুঃখবোধ করেন না।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

অভ্যাস বা সাধনসম্বন্ধে।

২০ প্র। গুরুদেব, সাধনাব্যতীত মনোরথ সিদ্ধ হয় না ; কিন্তু সাধনার প্রতি শ্রদ্ধা জন্মিবে কিরূপে ?

উ। গুরুবাক্যে শ্রদ্ধা জন্মিলেই সাধনার প্রতিও শ্রদ্ধা জন্মে। শিশু কাতর হইলেই জনকজননী তাহার ক্ষুধার শান্তি করিয়া থাকেন, সেই জন্য শিশু পিতামাতাকে শ্রদ্ধা করে, অর্থাৎ তাঁহাদের বাক্যে বিশ্বাস করে।

চিকিৎসক রোগীর রোগযন্ত্রণা তিরোহিত করেন, সেই জন্যই রোগী চিকিৎসকের বাক্যে শ্রদ্ধা করে, অর্থাৎ তাঁহার বাক্যে বিশ্বাস স্থাপন করে।

এইরূপে দেখা যায়, যে কোন ব্যক্তি আমাদের দুঃখ দূর করেন, তিনিই আমাদের শ্রদ্ধাস্পদ হন, অর্থাৎ তাঁহার কথাতেই আমরা বিশ্বাস স্থাপন করিয়া থাকি।

অতএব শ্রদ্ধা বা ভক্তিযুক্ত বিশ্বাস আমাদের সহজসম্পত্তি ; সুতরাং শ্রদ্ধা লাভ করিবার জন্য কিছুমাত্র আয়াস গ্রহণ করিবার প্রয়োজন হয় না ; স্বীয় দুঃখ অনুভব করিলেই আমরা সহজাত সংস্কারবশে শ্রদ্ধাস্পদের অন্বেষণ করিয়া থাকি, অর্থাৎ কে আমাদের দুঃখ দূর করিতে পারিবে, তাঁহারই অনুসন্ধান করি। অতএব

বুঝিয়া দেখ, দুঃখই শ্রদ্ধার জনক। এ জগতে দুঃখ না থাকিলে শ্রদ্ধাও থাকিতে পারিত না। কিন্তু এই দুঃখময় সংসারে দুঃখের অভাব নাই; সুতরাং এখানে শ্রদ্ধারও অভাব নাই।

কিন্তু দুঃখ যেমন শ্রদ্ধার জনক, তেমনই দুঃখই আবার শ্রদ্ধার বিনাশক ; যাহার নিকট আমি দুঃখের উপশান্তির আশায় গমন করিলাম, সে যদি আমার দুঃখের শান্তি করিতে না পারে, তবে তাহার প্রতি আমার শ্রদ্ধা জন্মে না। পুনঃ, সেই ব্যক্তি যদি আমার দুঃখের শান্তি না করিয়া বৃদ্ধি করে, তবে তাহার প্রতি অশ্রদ্ধারই উদয় হয়। এইরূপেই শ্রদ্ধার বিনাশ ও অশ্রদ্ধার উদয় হইয়া থাকে।

অতএব দুঃখ দূর করিবার জন্য স্থান-কাল-পাত্র বিবেচনা না করিয়া, যত্রতত্র ধাবিত হওয়া কর্ত্তব্য নহে। যাহার দুঃখনিবারণের শক্তি নাই, যে স্বয়ং সহস্র দুঃখে অভিভূত তাহার কাছে দুঃখনিবারণের আশায় ধাবিত হইলে দুঃখ দূর হয় না, সুতরাং শ্রদ্ধারও উদয় হয় না। ফলতঃ যে ব্যক্তি ক্ষুধায় কাতর হইয়া মুষ্টিভিক্ষার জন্য লালায়িত তাহার কাছে তুমি ক্ষুধাশান্তির জন্য প্রার্থনা করিলে, তোমার অভিলাষ পূর্ণ হওয়া সম্ভাবিত নহে।

অনেকেই দুঃখশান্তির জন্য সুখের অন্বেষণ করে; তাহারা চক্ষুঃ, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক্ এই পঞ্চ ইন্দ্রিয়-বিষয় উপভোগ করাকেই সুখ মনে করে। অর্থাৎ তাহারা সুন্দর দৃশ্য, সুললিত স্বর, সদ্গন্ধ, প্রিয় খাদ্য এবং

সুখদ স্পর্শ দ্বারা জীবন সুখে অতিবাহিত করিতে অভিলাষ করে; এবং এই অভিলাষ পূরণের জন্য প্রাণপণ যত্নও করিয়া থাকে। সেই যত্নের মধ্যে তাহারা কত যে ক্লেশ ভোগ করে, তাহার ইয়ত্তা নাই। পুনঃ, তাহাদের যত্ন সফল হইলেও অর্থাৎ তাহারা ইন্দ্রিয়ভোগ্য সমস্ত বিষয় প্রাপ্ত হইলেও পরিণামে আশানুরূপ সুখ বা তৃপ্তি লাভ করিতে পারে না। কেননা বিষয়ভোগ করিতে করিতে বিষয়লালসা ক্রমশঃই বর্দ্ধিত হয়, অথচ অল্পদিন-স্থায়ি যৌবন গত হইলেই ইন্দ্রিয়গণ বিষয়ভোগে অসমর্থ হইয়া পড়ে; অর্থাৎ যৌবন গত হইলেই দর্শন-শ্রবণাদি সমস্ত ইন্দ্রিয়ই ক্ষীণ ও শিথিল হইয়া অভিলষিত সুখ বা তৃপ্তি দান করিতে অসমর্থ হয়; তখন প্রকৃতিবশতঃই মনে ঘোরতর নৈরাশ্য ও বিষাদ আসিয়া উপস্থিত হয় এবং বার্দ্ধক্যে অশেষ কষ্টভোগ হইয়া থাকে। যৌবনের সুখের স্মৃতি বার্দ্ধক্যের সেই কষ্ট—সেই হতাশ জীবনের বিষাদ কিছুতেই নিবৃত্ত করিতে পারে না। কেননা, লোকে যখন ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয়ভোগ করে, তখন কেবল দুঃখ-ময় জীবনের দুঃখ কিছুক্ষণের জন্য বিস্মৃত হয় মাত্র; সুখের স্মৃতি মনে অঙ্কিত হয় না। সেই জন্য লোকে দুঃখের কথা যত স্মরণ রাখিয়া থাকে, সুখের কথা তত স্মরণ রাখিতে পারে না।

অতএব বিষয়ভোগে দুঃখ-নিবৃত্তির আশা করা বিড়ম্বনা মাত্র। ফলতঃ বিষয়ভোগ-লালসা পরিণামে দুঃখের বৃদ্ধিই করিয়া থাকে; যেহেতু তুমি যদি কিছুকাল সুখভোগ

করিয়া শেষে দুঃখভোগ কর, তবে সেই দুঃখ তোমার পক্ষে নিতান্তই অসহ্য হইবে। এই জন্যই সচরাচর লোকে বৃদ্ধাবস্থায় মৃত্যুকামনা করিয়া থাকে। তাহারা মনে করে মৃত্যু হইলেই দুঃখ দূর হইবে। কিন্তু মোহান্ধগণ বুঝিতে পারে না যে, মৃত্যু হইলেও দুঃখের অবসান হইবে না; দুঃখ দূর করিবার প্রকৃষ্ট পন্থা অবলম্বন না করিলে দুঃখ কখনই দূর হইবে না।

সেই চিরদুঃখ-নিবৃত্তির প্রকৃষ্ট পন্থা প্রাপ্তির জন্য ঐকান্তিক শ্রদ্ধার আবশ্যক। পিতামাতা আমাদের নিরুপায় শৈশবে প্রতিপালন করিয়া আমাদের সামান্য দুঃখ দূর করাতেই আমরা তাঁহাদিগকে দেবতা বলিয়া ভক্তি-শ্রদ্ধা করি। চিকিৎসক সামান্য রোগযন্ত্রণা হইতে আমাদিগকে মুক্ত করেন বলিয়া আমরা তাঁহাকে দেবতার ন্যায় মান্য করি। কিন্তু কি পিতামাতা, কি চিকিৎসক কেহই আমাদের অনন্ত দুঃখ-প্রবাহ নিবারণ করিতে পারেন না।

কর্ম্মাশয় বা বাসনার নিবৃত্তিসাধনই সেই চিরদুঃখ-নিবৃত্তির প্রকৃষ্ট পন্থা। কিন্তু বাঞ্ছাকল্পতরু বিশ্বপতি পরমাত্মার সাক্ষাৎ অনুভূতি ব্যতীত সেই বাসনার নিবৃত্তি-সাধন অসাধ্য।

"ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ।
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে॥"

এই বেদান্তবাক্যই উল্লিখিত বাক্যের প্রমাণ।

কিন্তু পরমাত্মার সাক্ষাৎ অনুভূতি করিবে কে? জড় চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা প্রভৃতি বাহ্যেন্দ্রিয় অথবা জড় অন্তঃ-

করণ সেই অনুভূতি বিষয়ে অসমর্থ। তবে আর কে সেই অনুভূতি করিবে? বিশুদ্ধ-সত্ত্ব অন্তঃকরণে বা বুদ্ধিতে প্রতিফলিত সেই বিশাল বিরাট পরমাত্মারই অণুমাত্র জ্যোতিঃ সেই অনুভূতি বিষয়ে সমর্থ। এই জন্যই বেদান্ত বলিয়াছেন,—

> "নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো
> ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন।
> যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্য-
> স্তস্যৈষ আত্মা বৃণুতে তনূং স্বাম্।
> নাবিরতো দুশ্চরিতান্নাশান্তো না সমাহিতঃ।
> নাশান্তমানসো বাপি প্রজ্ঞানেনৈনমাপ্নুয়াৎ॥"

অতএব সর্ব্বদুঃখ নিবৃত্তির জন্য অগ্রে অন্তঃকরণ পবিত্র করা আবশ্যক; অন্তঃকরণ বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণ দ্বারা পবিত্র হইলেই তাহাতে আত্মানুভূতি জন্মে। সেই আত্মানুভূতি দ্বারাই পরমাত্মার অনুভূতিও জন্মে। সেই পরমাত্মার অনুভূতির নামই দিব্যজ্ঞান; সেই জ্ঞান জন্মিলেই সর্ব্ব সংশয় ছিন্ন হয় এবং সকল বাসনার লয় হয়। তাহা হইলেই এই সংসার-নরকে আর জন্মগ্রহণ করিতে হয় না; সুতরাং দুঃখপ্রবাহেরও নিবৃত্তি হয়।

বেদবেদান্তাদি আর্য্যশাস্ত্রে ঐ সকল কথার প্রমাণ আছে। এবং অদ্যাপি এই পুণ্যভূমিতে সর্ব্বদুঃখ-বিমুক্ত বা জীবন্মুক্ত পুরুষেরও অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয় নাই। অধুনা পৃথিবীর নানাস্থানে সাংসারিক নানাবিষয়ের আবিষ্কার ও উন্নতি হইতেছে, কিন্তু সেই সকল আবিষ্কার বা উন্নতি

মনুষ্যের সর্ব্বদুঃখ নিবারণ করিতে কস্মিন্ কালেও পারিবে না। তজ্জন্যই সুবিবেচক পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণও এখন বেদ-বেদান্তাদি আর্য্যশাস্ত্রের নামে মস্তক অবনত করিয়া থাকেন। ফলতঃ আর্য্য ঋষিগণ চিরদিনই সমগ্র পৃথিবীতে পূজিত ছিলেন এবং চিরদিনই তদ্রূপ পূজনীয় থাকিবেন। তাঁহাদের বাক্যাবলি প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ। তাহাতে প্রতারণা বা প্রবঞ্চনা নাই। তাঁহারা মুক্তির জন্য যে সুপ্রশস্ত পন্থা নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন, সেই পথের কিছুদূর গমন করিলেই দুঃখনিবৃত্তির স্পষ্ট নিদর্শন সকল অনুভূত হইতে থাকে।

অতএব আর্য্য ঋষিগণের বাক্যে শ্রদ্ধা স্থাপন করিলেই নিশ্চয়ই সর্ব্বদুঃখের নিবৃত্তি হইবে। নিবৃত্তি হয় কি না তাহা যখন সামান্য পরীক্ষা দ্বারাই জানা যায়, তখন শ্রদ্ধা উৎপাদনের জন্য আর কি বলিব? ক্ষুধিত ব্যক্তিকে বলিতে পারি, এই খাদ্য আহার কর, করিলেই তোমার ক্ষুধাশান্তি হইবে। ইহা অপেক্ষা অধিক আর কি বলিব? ফলতঃ যে অশেষ দুঃখ ভোগ করিয়াছে, সেই আর্ত্ত ব্যক্তি আর্য্য ঋষিগণের উপদেশ অনুসারে চলিলেই দুঃখমুক্ত হইতে পারে, তাহাতে কিছুমাত্র সংশয় নাই। কিন্তু যে এই সরল সত্যে বিশ্বাস করিতে পারে না, তাহার পক্ষে আরও দুঃখভোগ করা আবশ্যক; সুতরাং ইহজন্মে তাহার মুক্তির আশা বিড়ম্বনা মাত্র। তবে যে যতই বিমূঢ় বা মোহান্ধ হউক্ না কেন, কোন না কোন জন্মে তাহাকে দুঃখমোচনের প্রকৃষ্ট পন্থা অন্বেষণ করিতেই হইবে, এবং

তখন তাহাকে অগত্যা আৰ্য্য ঋষিগণের বাক্যের গুরুত্ব অনুভব করিয়া তাহাতে শ্রদ্ধা স্থাপন করিতেই হইবে।

অতএব মহাত্মাদিগের উপদেশ ঊষরে উপ্ত বীজের ন্যায় কখনই ব্যর্থ হয় না। ঘোর মোহান্ধকেও সত্য উপদেশ দিলে, তাহা ইহজন্মে—কিছুদিনের জন্য ব্যর্থ হইলেও অন্ততঃ কোন এক জন্মেও সেই উপদেশ ফলদায়ক হইবেই হইবে। অতি অল্পক্ষণের জন্যও যদি কোন দুরাচারের মনের চাঞ্চল্য কোনরূপে নিবারণ করিয়া সেই মনে অমোঘ সত্যস্বরূপ ঋষিবাক্য অঙ্কিত করা যায়, তবে ইহজন্মে কোন সময়ে অথবা পরজন্মেও সেই বাক্যের স্মৃতি স্বতঃই তাহার মনে উদিত হইবে, তখন সে দুঃখের অসহ্য তাড়নে বিতাড়িত হইয়া সেই গুরুবাক্যে শ্রদ্ধা স্থাপন করিয়া তাহার ফল পরীক্ষার জন্য যত্নবান্ হইবে; এবং তাহা হইলেই তাহার নূতন জীবন বা দ্বিজত্ব লাভ লইবে।

অতএব আপাততঃ শ্রদ্ধা করুক্ বা না করুক্, শ্রদ্ধাস্পদ ঋষিগণের বাক্য নীচমতি শূদ্রকেও শুনাইলে তাহার ফলে সে কোন জন্মে অবশ্যই দ্বিজত্ব লাভ করিতে পারিবে।

২১ প্র। ব্রহ্মন্! আজ আপনার বাক্যে হৃদয়ে আশার সঞ্চার হইল। চঞ্চল মনে শ্রদ্ধা অধিকক্ষণ স্থান পায় না বলিয়া নৈরাশ্যে মগ্ন হইতাম, তবে এখন বলুন, শৌচ দ্বারা কি উপকার লব্ধ হয়?

উ। বৎস, সত্যবাদী ঋষিগণ বলিয়াছেন;—

"শৌচাৎ স্বাঙ্গজুগুপ্সা পরৈরসঙ্গশ্চ।"

অর্থাৎ বহিঃশৌচ সাধন করিলে স্বীয় শরীরের প্রতি ও পরসংসর্গের প্রতি ঘৃণা জন্মে।

শরীর নিয়ত পরিষ্কৃত রাখিতে চেষ্টা করিয়াও দেখা যায় যে, ইহা হইতে অবিরত ক্লেদ নির্গত হইতেছে। এই শরীর রসরক্তমাংসমেদাদি অপবিত্র পদার্থে নির্ম্মিত; ইহা বিষ্ঠামূত্রাদি অশুচি পদার্থের আধার; ইহা অসংখ্য কৃমিকীটের আবাস; শৌচসাধনে এই সকল বিষয়ে সহজেই ঘৃণা জন্মে, এবং এই দেহ যে নিতান্ত জঘন্য ও অনাত্ম বস্তু তদ্বিষয়েও প্রতীতি জন্মে।

আবার স্বীয় দেহের প্রতি ঘৃণা জন্মিলে পরশরীরের প্রতিও ঘৃণা জন্মে; সুতরাং স্ত্রীসংসর্গাদিজনিত নারকীয় বিষয় সুখের অভিলাষও তিরোহিত হয়; তাহাতে স্বীয় দেহে বীর্য্য সুরক্ষিত হওয়াতে সত্বগুণের বৃদ্ধি হয় এবং ব্রহ্মতেজঃ উৎপন্ন হয়।

শৌচসাধন না করিলে অভ্যাসবশতঃ অশুচিপদার্থে ঘৃণা জন্মে না, সুতরাং পশুবৃত্তিরও নিবৃত্তি হয় না। অভ্যাসবশতঃ মেথরেরা বিষ্ঠার গন্ধকেও দুর্গন্ধ বলিয়া বোধ করে না। তদ্রূপ অভ্যাসবশতই ইতরসাধারণ জনগণ কামিনীর মুখের ক্লেদ "অধর-সুধা" বলিয়া পান করে, এবং অতি দুর্গন্ধময় অতি অপবিত্র ক্ষেত্রে আনন্দ অনুভব করে! ফলতঃ একজন মেথরকে যদি তুমি বল "ওরে হতভাগা! অতি দুর্গন্ধ শটিত বিষ্ঠার ভার মস্তকে বহন করিতে তোর কি ক্লেশ হয় না? তুই এই জঘন্য ব্যবসায় ত্যাগ করিয়া অন্য ব্যবসায় অবলম্বন কর্।'

তাহা হইলে সে তোমার কথায় উপেক্ষা করিয়া চলিয়া যাইবে। তদ্রূপ শৌচাচারবিহীন কোন ব্যক্তিকেও কামিনীসম্ভোগসুখের জঘন্যতা বুঝাইতে গেলেও সে তোমার বাক্যে উপেক্ষা ও উপহাস করিবে। সেই জন্যই একজন কবি যেন বিস্মিত হইয়াই লিখিয়াছেন,—

"সমাশ্লিষ্যত্যুচ্চৈর্ঘনপিশিতপিণ্ডং স্তনধিয়া
মুখং লালাক্লিন্নং পিবতি চষকং সাসবমিব।
অমেধ্যক্লেদার্দ্রে পথি চ রমতে স্পর্শরসিকো
মহামোহান্ধানাং কিমপি রমণীয়ং ন ভবতি?!

অর্থাৎ ঘোর তমসাচ্ছন্ন মোহান্ধগণ কামিনীবক্ষঃস্থিত উচ্চ মাংসপিণ্ডকে "স্তন" বলিয়া মোহিত হয়! মুখের লালাকে অমৃততুল্য বোধ করে! আর অতি অপবিত্র কুৎসিত স্থানে স্পর্শসুখ অনুভব করে! অতএব মহা-মোহান্ধ পামরগণের পক্ষে এ সংসারের সকলই মনোহর!"

কিন্তু এই মোহান্ধতা কদভ্যাসেরই ফল। শৌচ-সাধনদ্বারা শৌচাশৌচ বিষয়ে অনুভূতি না জন্মিলে এইরূপ মোহান্ধতা দূরীভূত হয় না। এই জন্যই শৌচসাধন আবশ্যক।

"অমেধ্যপূর্ণে কৃমিজালসঙ্কুলে
স্বভাবদুর্গন্ধিবিনিন্দিতান্তরে
কলেবরে মূত্রপুরীষ-ভাবিতে
রমন্তি মূঢ়া বিরমন্তি পণ্ডিতাঃ।"

অর্থাৎ অত্যন্ত অপবিত্র, কৃমিজালসঙ্কুল, স্বভাবতঃই

দুর্গন্ধি, মূত্রপুরীষপূর্ণ এই দেহে মূর্খেরাই রমণ করে, কিন্তু পণ্ডিত ব্যক্তিরা তাহাতে বিরতই হইয়া থাকেন।” এখানে “পণ্ডিত” শব্দে শৌচাচারসম্পন্ন ও বিশুদ্ধ অনুভূতিসম্পন্ন জ্ঞানী ব্যক্তিকেই বুঝিতে হইবে।

শৌচসাধন ব্যতীত মহাপণ্ডিতেরাও শরীরের জঘন্যতা অনুভব করিতে সমর্থ হন না। ফলতঃ স্মরণ রাখিও “জানা” আর “অনুভব করা” একই কথা নহে। “জানা” অধ্যয়নের ফল; কিন্তু “অনুভব করা” সাধনার ফল।

অতএব বহিঃশৌচের আবশ্যকতা বা উপকার হৃদয়ঙ্গম কর। এক্ষণে অন্তঃশৌচের উপকারিতা বলিতেছি শুন;—পরমর্ষি মহাত্মারা বলিয়াছেন

“সত্ত্বশুদ্ধিসৌমনস্যৈকাগ্র্যেন্দ্রিয়জয়াত্মদর্শনযোগ্যত্বানি চ।”

অর্থাৎ অন্তঃশৌচ সাধন করিলে যথাক্রমে সত্ত্বশুদ্ধি, সৌমনস্য, একাগ্রতা, ইন্দ্রিয়জয় এবং আত্মদর্শনযোগ্যতা জন্মে।

অন্তঃশৌচ দ্বারা প্রথমে অন্তঃকরণ সত্ত্বগুণে অতি বিশুদ্ধ বা পবিত্র হয়; অন্তঃকরণের সেই পবিত্রতা মনকে প্রফুল্ল বা আনন্দিত করে, মন সর্ব্বদাই তাহাতে পরিতৃপ্ত থাকে, যেন সংসারে সকল অভাবই পূর্ণ হইয়াছে বলিয়া তখন সেই মনে পরম তৃপ্তি বা শান্তি অনুভূত হইতে থাকে; সেই শান্তি বা তৃপ্তিই মনের একাগ্রতা উৎপন্ন করে, অর্থাৎ মন সত্ত্বগুণের আধিক্যহেতু রজঃসম্ভূত চঞ্চলতা পরিত্যাগ করিয়া সুস্থির হওয়াতেই সহজে একাগ্রতা বা সমাধিযোগ্য অবস্থা প্রাপ্ত

হয়; একাগ্রতা বা সমাধি জন্মিলেই সমস্ত ইন্দ্রিয় বশীভূত হয়; অর্থাৎ একাগ্রতা দ্বারা, চক্ষুঃকর্ণাদি ইন্দ্রিয়কে সহজেই স্ব স্ব বিষয় হইতে প্রত্যাহৃত বা প্রতিনিবৃত্ত করা যায়। ইন্দ্রিয়গণ বশীভূত হইলেই ক্রমশঃ একাগ্রতা বর্দ্ধিত হয়; তখন সেই বিশুদ্ধ ও স্থির অন্তঃকরণে আত্ম-জ্যোতিঃ বা নিবিড় আত্মানন্দ সহজেই অনুভূত হয়।

অতএব বুঝিয়া দেখ, অন্তঃশৌচই সর্ব্বদুঃখবিমুক্তির পথে নীত করে। ফলতঃ অন্তঃশৌচের মহিমা বা প্রভাব সম্যক্ ব্যক্ত করা দুঃসাধ্য। অন্তঃশৌচই যোগসাধনের ও আত্মানুভূতির প্রকৃষ্ট উপায়। অধিক কি বলিব, অন্তঃ-শৌচ ব্যতীত অন্য কোন উপায়েই আত্মানুভূতি জন্মিতে পারে না; অন্তঃশৌচ ব্যতীত আন্তরিক দুঃখের নিবৃত্তি ও নিবিড় আনন্দের অনুভূতি হয় না। অন্তঃশৌচ ব্যতীত অন্তঃকরণ দিব্যজ্ঞানের উপযোগী একাগ্রতা বা সমাধি লাভ করিতে পারে না।

২২ প্র। দেব, শুনিয়াছি একাগ্রতা বা সমাধি দ্বারা অলৌকিক শক্তি লাভ করা যায়। ইহার হেতু কি?

উ। আতসী পাতরে ইতস্ততোবিক্ষিপ্ত সূর্য্যরশ্মি কেন্দ্রীভূত হইলে যেমন অগ্নিস্বরূপ হইয়া থাকে, তেমনই রজো-বিক্ষিপ্ত মন যদি সত্ত্বগুণপ্রভাবে একাগ্র বা সমাহিত হয়, তবে সেই মনে অলৌকিক শক্তি জন্মে। ইহা যোগি-ঋষিগণের পরীক্ষাসিদ্ধ সত্য।

২৩ প্র। ভগবন্! অন্তঃশৌচসাধনের অশেষ ফলের বিষয় হৃদয়ঙ্গম করিয়াছি, কিন্তু পশ্বাচারবিধি বলিবার সময় বলিয়াছেন, "জপ এবং ধ্যান দ্বারাই

অন্তঃশৌচ সমাহিত হইবে ; তজ্জন্য অন্যান্য বিধি বাহুল্যমাত্র।" এতদ্দ্বারা বুঝিয়াছি, অন্তঃশৌচ সাধনের অন্যান্য বিধিও আছে ; বাহুল্য হইলেও সেগুলি শুনিতে ইচ্ছা করি ; কৃপা করিয়া বলুন্।

উ। অহিংসা, সত্য, অস্তেয় প্রভৃতি যমনিয়ম সাধনের সমস্ত ব্যবস্থাই অন্তঃশৌচ সাধনের জন্যই বিহিত হইয়াছে, অথবা অষ্টাঙ্গ যোগসাধনের সমস্ত ব্যবস্থাই অন্তঃশৌচের জন্য বিহিত হইয়াছে। সেই অষ্টাঙ্গ যোগসাধন অতীব বিস্তৃত বা বাহুল্য। যোগশাস্ত্রও অসংখ্য। সমগ্র নীতি-শাস্ত্রের ও সমগ্র স্মৃতিশাস্ত্রের ব্যবস্থাও এই অন্তঃশৌচ-সাধনের উদ্দেশেই লিখিত। সমস্ত বেদ, পুরাণ, তন্ত্র, অন্তঃশৌচ-সাধনের জন্যই প্রচারিত। ফলতঃ যাবতীয় সৎকার্য্যের ও সাধুচিন্তার ব্যবস্থাই অন্তঃশৌচের জন্যই বিহিত হইয়াছে।

কিন্তু একমাত্র ধ্যানসহকৃত জপ দ্বারাই সেই নিখিল সৎকার্য্যের উদ্দেশ্য অর্থাৎ অন্তঃশৌচ সমাহিত হইয়া থাকে। দুষ্কার্য্য অপেক্ষা সাংসারিক সৎকার্য্য শ্রেষ্ঠ ; কিন্তু সাংসারিক সৎকার্য্য অপেক্ষাও পারমার্থিক কার্য্য শ্রেষ্ঠ। সেই জন্যই ধ্যানসহকৃত মন্ত্রজপ সর্ব্ববিধ সৎ-কার্য্য অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ। ধ্যানসহকৃত মন্ত্রজপের নামই মন্ত্রযোগ। এই মন্ত্রযোগ অপেক্ষা সহজসাধ্য অথচ উৎকৃষ্ট যোগ আর নাই। এই মন্ত্রযোগ নিষ্কাম পারমার্থিক কার্য্য। ইহা অহৈতুকী ভক্তিমূলক। মন্ত্রযোগীর পক্ষে সাংসারিক দুষ্কার্য্যের সম্ভাবনা নাই। সাংসারিক কোনও সৎকার্য্যই ইহা অপেক্ষা অধিক ফলপ্রদ নহে।

২৪ প্র। পারমার্থিক কার্য্য দ্বারা ঐহিক কি উপকার হয়?

উ। ঐহিক উপকারও পারমার্থিক কার্য্যের আনুষঙ্গিক ফল। অর্থাৎ পারমার্থিক মন্ত্রযোগ ঐহিক সমস্ত অভিলাষও পূর্ণ করিয়া থাকে।

২৫ প্র। হোমের উপকারিতা কি?

উ। হোম শৌচসাধনের উৎকৃষ্ট সহকারী। হোম দ্বারা হোমগৃহের বায়ু পরিশোধিত হয়; এবং সেই গৃহ হইতে কুপ্রবৃত্তি-প্রণোদক পিশাচাদির তিরোভাব ও সুপ্রবৃত্তি-প্রণোদক দেবগণের আবির্ভাব হয়।

কোন গৃহে কেবল অগ্নি জ্বালিলেই দূষিত বায়ুর বিষাক্ত অণুসমূহ বিনষ্ট হয়; পুনঃ সেই অগ্নিতে ঘৃতসিক্ত বিল্বপত্র দগ্ধ করিলে বায়ু অতীব স্বাস্থ্যজনক ও মনের সত্ত্ববর্দ্ধক হয়। ফলতঃ সেই বায়ু সত্ত্বপ্রধান হয় বলিয়াই সেখানে সাত্ত্বিক দেবগণের আবির্ভাব এবং তামসিক ও রাজসিক রাক্ষস-পিশাচাদির তিরোভাব হয়। সুতরাং সেই গৃহে অবস্থিতি করিলে অন্তঃকরণ সাত্ত্বিকভাবে পূর্ণ হয়; তখন সেই অন্তঃকরণ যাবতীয় কুচিন্তা হইতে বিমুক্ত হয় এবং উৎসাহ ও আনন্দে পূর্ণ হয়।

২৬ প্র। অদৃশ্য পিশাচাদি আমাদের মনে কিরূপে কুপ্রবৃত্তি প্রদান করে?

উ। সংসারে সর্ব্বদাই দেখিতে পাইবে যে, যে যেমন লোক তাহার তদ্রূপ সংসর্গ জুটিয়া থাকে। যে দুই ব্যক্তির মধ্যে বিশেষ প্রণয় দেখিবে, তাহাদের একজনের চরিত্র জানিতে পারিলেই অপরের চরিত্রও জানা হয়। ইহা স্থূলদৃষ্টির বিষয়। কিন্তু স্থূলদৃষ্টির বহির্ভূত অথচ অন্তর্দৃষ্টির বিষয়ীভূত ব্যাপারও ঠিক্ এইরূপই জানিবে।

অন্তঃকরণ যেরূপ ভাবাপন্ন থাকিবে, ঠিক্ সেইরূপ ভাবাপন্ন বিদেহ দেবযোনি বা প্রেতাত্মারাও সেই অন্তঃকরণ পরিবৃত করিয়া থাকে। এই জন্যই জগতে "যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী" এই পরীক্ষাসিদ্ধ বাক্যের প্রচার হইয়াছে।

একাগ্রচিত্তে কোন দুষ্কার্য্যের চিন্তা করিলেই দেখিতে পাইবে, সেই দুষ্কার্য্যসাধনের সহকারী একজন দুরাচার তোমার নিকট শীঘ্রই উপস্থিত হইবে।

আবার একাগ্রচিত্তে কোন সৎকার্য্যের চিন্তা করিলেই দেখিতে পাইবে যে, সেই সৎকার্য্যসাধনের সহকারী কোন সজ্জন তোমার নিকট শীঘ্রই উপস্থিত হইবেন।

এই সকল ব্যাপার কাকতালীয় ঘটনা নহে; ইহাদের অভ্যন্তরে কোন গূঢ় রহস্য আছে; সেই রহস্য যোগী-দিগের অনুভূতির বিষয়।

ফলতঃ এই স্থূলপ্রত্যক্ষ জগতে স্থূলদেহধারী সৎ বা অসৎ মনুষ্যগণ যেরূপ চেষ্টায় বিব্রত রহিয়াছে, অদৃশ্য জগতেও দেবাত্মা বা পিশাচাদিও ঠিক্ তদনুরূপই চেষ্টায় বিব্রত রহিয়াছে। সেই সূক্ষ্মশরীরধারীদের ইচ্ছাশক্তি অতীব প্রবল। স্থূলদেহধারীরা শারীরিক শক্তি দ্বারা যাহা সাধন করে, বিদেহগণ ইচ্ছাশক্তি দ্বারাই তাহা সাধন করিতে পারে। তাহারা স্থূলদেহধারী নরগণের অন্তঃকরণে অনায়াসে প্রবেশ লাভ করিতে পারে এবং অন্তঃকরণকে স্বেচ্ছাক্রমে পরিচালিত করিতেও পারে।

কিন্তু সাত্ত্বিক অন্তঃকরণে রাজসিক বা তামসিক

প্রেতেরা তিষ্ঠিতে পারে না। ফলতঃ কি দেহী কি বিদেহী সকলেই সমপ্রকৃতির অন্বেষণ করে এবং সকলেই সম-প্রকৃতির সাহায্য করে। চোরের সঙ্গেই চোর থাকিতে ভালবাসে এবং সাধুর সঙ্গেই সাধু থাকিতে ভালবাসে।

অদৃশ্য জগতের অনেক গূঢ়-রহস্য আছে; সে সকল রহস্য ব্যক্ত করিলে সংসারে অনেক বিপর্য্যয় ভীষণকাণ্ড উপস্থিত হইতে পারে বলিয়া যোগীরা তাহা প্রকাশ করেন না। যাহা হউক্ সামান্য একটী রহস্যের কথা বলি, ইহা স্মরণ রাখিও। কিন্তু সাধনা দ্বারাই ইহার প্রমাণ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবে।

অধুনা বৈদ্যুতিক-যন্ত্রের সাহায্যে শব্দতরঙ্গকেও লোকে আয়ত্ত করিয়াছে; কিন্তু জানিও, শব্দতরঙ্গের অপেক্ষাও সূক্ষ্মতর চিন্তাতরঙ্গও পৃথিবীর একপ্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্য্যন্ত অবিরত প্রবাহিত হইতেছে। সেই চিন্তাতরঙ্গ আয়ত্ত করিবার যন্ত্র অদ্যাপি আবিষ্কৃত হয় নাই; কিন্তু যোগীদিগের সমাহিত চিত্ত সেই চিন্তা-তরঙ্গ অবলীলাক্রমে আয়ত্ত করিতে পারে। এই জগৎ সেই চিন্তাতরঙ্গে পরিব্যাপ্ত। তুমি যে কোন চিন্তা করিবে, সেই চিন্তাতরঙ্গ তোমার সমপ্রকৃতিক সহস্র সহস্র অন্তঃকরণকে আহত করিয়া ছুটিবে। এইরূপ ঘাত-প্রতিঘাতে অন্তঃকরণ নিয়তই চঞ্চল হইতেছে জানিবে। এই চিন্তা-প্রবাহ স্থূল-সূক্ষ্ম-দেহধারী সক-লেরই সমান। এই চিন্তাতরঙ্গের আঘাত অন্তঃকরণে

অনুভব করিয়াই সমাহিত-চিত্ত যোগীরা বিদেহ প্রেত-গণের অস্তিত্ব প্রত্যক্ষবৎ অনুভব করিয়া থাকেন।

একজন প্রসিদ্ধ বঙ্গীয় লেখক তাঁহার পুস্তকে লিখিয়াছেন,—"পাপরূপ পিশাচ কখন কোন্ দুর্লক্ষ্য সূত্র অবলম্বন করিয়া যে মনোমন্দিরে প্রবেশ করিবে, তাহা কে বলিতে পারে?" ইহা প্রকৃত কথা। সামান্য লোকেরা পাপপ্রবৃত্তির হেতু অবধারণ করিতেও সমর্থ নহে। ফলতঃ পাপ যে কিরূপে মনে প্রবেশ করে, তাহা অসমাহিত ব্যক্তিদের বুদ্ধির অগম্য।

রাজসিক ও তামসিক চিত্তই পিশাচগণের প্রিয় স্থান। রাজসিক ও তামসিক চিন্তাপ্রবাহরূপ দুর্লক্ষ্য সূত্র তদ্রূপ চিত্তসমূহকে যেন একসূত্রে গ্রথিত করিয়া থাকে; কিন্তু সেই প্রবাহরূপ সূত্র সাত্ত্বিক চিত্তে আঘাত করিবামাত্রই প্রতিহত হইয়া যেন ছিন্নভিন্ন হইয়া যায়; সুতরাং সাত্ত্বিক অন্তঃকরণে রাজসিক ও তামসিক অর্থাৎ পৈশাচিক চিন্তা স্থান প্রাপ্ত হয় না।

কিন্তু সাত্ত্বিক অন্তঃকরণেও পৈশাচিক চিন্তাতরঙ্গের আঘাত লাগিয়া থাকে, যেহেতু কোনও অন্তঃকরণ সম্পূর্ণরূপে রজস্তমঃ বর্জ্জিত হইতে পারে না। অতএব সেই পৈশাচিক চিন্তাতরঙ্গের আঘাত হইতে অন্তঃরণকে রক্ষা করিবার জন্য সাত্ত্বিক চিন্তাতরঙ্গ উত্থিত করা আবশ্যক।

২৭ প্র। মৎস্যমাংসাদি খাদ্য সাক্ষাৎসম্বন্ধেই শরীরের বলপুষ্টি সম্পাদক; ইহা পরীক্ষাসিদ্ধ সত্য; অতএব সেই মৎস্যমাংসাদি পরিত্যাগ করিবার

আবশ্যকতা কি? শারীরিক স্বাস্থ্য যখন প্রার্থনীয়, তখন যে খাদ্য দ্বারা সেই স্বাস্থ্য লাভ করা যায়, সেই খাদ্যই ত প্রশস্ত?

উ। খাদ্যমাত্রেই বলপুষ্টিকর। অর্থাৎ ক্ষুধার সময় যাহা কিছু আহার করা যায়; তাহাই শরীরের ক্ষতিপূরণ করে; সুতরাং তাহাই বলদায়ক হইয়া থাকে।

কিন্তু সকল প্রকার খাদ্য সকলের রুচিকর বা প্রীতিকর নহে। রাজসিক প্রকৃতির লোকেরা মৎস্যমাংস ভালবাসে। যেহেতু মৎস্যমাংসই রজোগুণের বর্দ্ধক। আর ঘৃতদুগ্ধ সত্ত্বগুণের বর্দ্ধক বলিয়া সাত্ত্বিক প্রকৃতির লোকেরা ঘৃতদুগ্ধই ভালবাসেন।

সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ, এই তিনই দ্রব্যবাচক পদার্থ, ইহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। আহার্য্য দ্রব্যের সারাংশ হইতেই এই সত্ত্ব-রজঃ-তমঃ উৎপন্ন হয়। যে খাদ্য আহার করিলে মনের বা অন্তঃকরণের যেরূপ অবস্থা হয়, তাহা নিয়ত সাবধানে পরীক্ষা করিয়াই পূর্ব্বাচার্য্যগণ আহার্য্য দ্রব্যসকল সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক, এই তিনভাগে বিভক্ত করিয়াছেন।

মৎস্যমাংস আহার করিলেই শরীরের উত্তাপ বর্দ্ধিত হয় এবং মনও চঞ্চল হয়; সেই জন্যই মৎস্যমাংস রাজসিক খাদ্য বলিয়া গণ্য হইয়াছে।

মাদক দ্রব্যাদি দ্বারা শরীর ও মন ক্ষণিক উত্তেজিত হইয়া পরে অবসাদগ্রস্ত হয়, তজ্জন্যই তাহা তামসিক আহার্য্য বলিয়া গণ্য হইয়াছে।

ঘৃতদুগ্ধাদি ভোজ্য দ্বারা শরীর স্নিগ্ধ ও মন প্রসন্ন হয়, এই জন্যই উহা সাত্ত্বিক খাদ্য বলিয়া গণ্য হইয়াছে।

রজোগুণ মনের চাঞ্চল্যজনক বলিয়া কামক্রোধাদি বিবিধ কুপ্রবৃত্তিরও জনক। আর কামক্রোধাদিই বিবিধ পাপের সুতরাং বিবিধ দুঃখের জনক। অতএব রাজসিক খাদ্য আপাততঃ প্রীতিকর হইলেও তাহার পরিণাম দুঃখজনক। এই জন্যই মৎস্যমাংসাহার পরিত্যাগ করা আবশ্যক।

শারীরিক স্বাস্থ্য অবশ্য প্রার্থনীয়, তাহাতে সন্দেহ নাই; কেননা শরীর সুস্থ না থাকিলে মনও সুস্থ থাকিতে পারে না। কিন্তু মৎস্যমাংসাদি রাজসিক খাদ্য কখনই যথার্থ স্বাস্থ্যপ্রদ নহে; যেহেতু রাজসিক খাদ্য অন্তঃরণের চাঞ্চল্য বিধান করিয়া মনকে কামক্রোধাদি কুপ্রবৃত্তির অধীন করিয়া থাকে এবং সেই কুপ্রবৃত্তি হইতেই পাপের উৎপত্তি এবং পাপ হইতেই দুঃখের বা মনঃপীড়ার উৎপত্তি হয়। অতএব এরূপ ক্ষণিক সুখকর কিন্তু পরিণাম-দুঃখদায়ক রাজসিক খাদ্য কখনই প্রশস্ত নহে।

২৮ প্র। যদি মৎস্যমাংসাদি আহার করিয়া নিত্য নিয়মিতরূপে মন্ত্রযোগ সাধনা করা যায়, তাহাতে হানি কি?

উ। মৎস্যমাংসাদি আহার করিলেই মন রাজসিকভাব ধারণ করিবে; সেই মন তখন সহজেই পৈশাচিক প্রবৃত্তিনিচয়ের অধীন হইবে; সুতরাং তখন সেই মনের স্থৈর্য্য সম্পাদন করিয়া মন্ত্রযোগ অবলম্বন করা অতীব দুষ্কর বা দুঃসাধ্য হইবে। ফলতঃ, মৎস্যমাংসাদি ভোজনের প্রবৃত্তি দমন করিবার শক্তি বা শ্রদ্ধা যাহার নাই, তাহার

পক্ষে শ্রদ্ধান্বিত হইয়া মন্ত্রযোগ সাধন করা নিতান্ত অসঙ্গত কথা। যাহারা ক্ষণিক রসনার তৃপ্তিসাধনে লালায়িত, ক্ষণিক লোভের মায়া যাহারা ত্যাগ করিতে পারে না, তাহারা মনের রাজসিক প্রবল চাঞ্চল্য দমন করিয়া ধ্যান-পরায়ণ হইয়া মন্ত্রজপ করিবে, ইহা কখনই সম্ভাবিত নহে।

অতএব যাহারা মৎস্যমাংসাহার পরিত্যাগ করিতে না পারিবে, তাহাদের পক্ষে মন্ত্রযোগ সাধনেরও প্রয়োজন নাই; সেই কাপুরুষগণের পক্ষে বিবিধ যন্ত্রণাভোগ করিয়া মৃত্যুগ্রস্ত হওয়াই নিয়তি।

সাধনার জন্য পুরুষকারের প্রয়োজন। সাধনার জন্য দৃঢ় সঙ্কল্পের প্রয়োজন। দৃঢ় সঙ্কল্পের নামই প্রতিজ্ঞা বা সত্য। যে পুরুষাধম স্বীয় আধ্যাত্মিক উন্নতিসাধনে ও দুঃখ পরিহারে দৃঢ়সঙ্কল্পারূঢ় না হয়, তাহার পক্ষে প্রাকৃতিক নিয়তির বশে বিবিধ ক্লেশভোগ অনিবার্য্য।

অতএব যে রসনার ক্ষণিক প্রীতিসাধনে সুখাভাসের বা আপাত-প্রলোভনের বশীভূত হইয়া মৎস্যমাংসাদি রাজসিক খাদ্য ত্যাগ করিতে অসমর্থ, সে মন্ত্রযোগ-সাধনেরও নিতান্ত অযোগ্য পাত্র।

২৯ প্র। কিন্তু মৎস্যমাংসাদি আহার করাই যাহার চিরাভ্যস্ত, তাহার পক্ষে মৎস্যমাংস ত্যাগ করিলেই শারীরিক ও মানসিক গ্লানির সম্ভাবনা, কেননা অরুচিকর খাদ্য আহার করিলেই শরীর ক্ষীণ হওয়া সম্ভাবিত। অতএব এরূপ স্থলে সদুপায় কি?

উ। মনুষ্যেরা স্তন্যপায়ী জীব। মনুষ্যমাত্রেই ভূমিষ্ঠ

হইয়াই প্রথমে স্তন্য বা দুগ্ধ আহার করিয়া প্রাণধারণ করে। পরে বয়োবৃদ্ধি সহকারে মৎস্যমাংসাদি আহারে অভ্যস্ত হয়। কিন্তু সেই মৎস্যমাংসাহার ত্যাগ করিয়া যদি ঘৃতদুগ্ধ ও উদ্ভিজ্জ দ্রব্য আহার করে, তাহা হইলেও মনুষ্যের প্রাণধারণের কোন ব্যাঘাত হয় না। প্রাণধারণ করিবার জন্যই আহারের প্রয়োজন; কিন্তু স্মরণ রাখিও, আহার করিবার জন্যই প্রাণধারণের প্রয়োজন নহে। আধ্যাত্মিক উন্নতিসাধন অর্থাৎ সাংসারিক বিবিধ ক্লেশ হইতে মুক্তিলাভ করাই জীবনের পরমার্থ বা শ্রেষ্ঠ প্রয়োজন। সাত্ত্বিক আহার সেই প্রয়োজনসাধনের অনুকূল; কিন্তু রাজসিক ও তামসিক আহার সেই প্রয়োজন সাধনের প্রতিকূল। অতএব প্রাণপণ যত্নে রাজসিক ও তামসিক খাদ্য পরিত্যাগ করাই কর্ত্তব্য।

ফলতঃ সংসারে যখন সাত্ত্বিক খাদ্যেরও অভাব নাই, এবং তন্মধ্যে রুচিকর ও প্রীতিকর খাদ্যেরও অভাব নাই, তখন রাজসিক খাদ্যের লোভ ত্যাগ করাই কর্ত্তব্য। সাত্ত্বিক খাদ্য কখনই শরীরকে ক্ষীণ ও দুর্ব্বল করে না, অরুচিকর হইলেও পরম হিতকর ঔষধের ন্যায় তাহা বলপুষ্টি সাধন করিয়া থাকে। অতএব অভ্যাস ত্যাগ করিয়া সাত্ত্বিক খাদ্য আহার করিলেই যে শরীর ক্ষীণ ও দুর্ব্বল হইবে, ইহা কুসংস্কার-মূলক ভ্রান্তিমাত্র জানিবে।

মৎস্যমাংসাহারে যদি অত্যন্ত রুচি থাকে, তবে যোগ-

সাধন প্রথমভাগে "অপরিগ্রহ" সম্বন্ধে যাহা লিখিত হইয়াছে এবং যোগসাধন দ্বিতীয়ভাগে "কুভোজন" সম্বন্ধে যে সকল কথা বলা হইয়াছে, সেইগুলি সম্যক্ আলোচনা করিলেই মৎস্যমাংস ভোজনের প্রবৃত্তি অন্তর্হিত হইবে; মৎস্যমাংসের প্রতি অত্যন্ত ঘৃণাই জন্মিবে। তখন মৎস্যমাংসের গন্ধও অসহ্য হইয়া পড়িবে। অতএব মৎস্যমাংস পরিত্যাগের পক্ষে ইহাই সদুপায়।

৩০ প্র। শুনিয়াছি পরমহংসগণ খাদ্যাখাদ্য বিচার করেন না। মৎস্যমাংসাদি ভোজনে তাঁহাদের নিষেধবিধি নাই; অতএব এরূপ উন্নতাত্মা ব্যক্তিগণের অনুকরণ করিলে দোষ কি? সামান্য লোকের পক্ষে যখন মহাজনগণের গম্য পথই অনুসরণ করা কর্তব্য, তখন পরমহংসগণ যেরূপ আচরণ করেন তদ্রূপ আচরণই ত সঙ্গত বলিয়া বোধ হয়?

উ। যাঁহারা যথার্থ পরমহংস, তাঁহারা প্রথমে যমনিয়মাদি সাধন এবং কঠোর তপঃসাধন করিয়া থাকেন। তদনন্তর তাঁহাদের চিত্ত শুদ্ধসত্ত্বগুণপ্রধান হইলে তাঁহারা যোগসাধনে রত হন। অর্থাৎ তাঁহাদের সেই চিত্তকে তখন কেবল আত্মধ্যানে নিমগ্ন করেন। তদবস্থায় তাঁহারা সর্ব্বকর্ম্ম পরিত্যাগ করেন এবং সাংসারিক বাসনাও ত্যাগ করেন। সুতরাং তৎকালে তাঁহাদের খাদ্যাখাদ্য বিচার না থাকিবারই কথা বটে; কিন্তু তথাপি তাঁহারা যে সেই অবস্থায় মৎস্যমাংসাদি ভোজন করেন, এরূপ মনে করিও না। তাঁহারা যতদিন স্থূল শরীর রক্ষা করা আবশ্যক বোধ করেন, ততদিন ক্ষুধার উদ্রেক হইলেই আহার গ্রহণ করিয়া থাকেন। কিন্তু তাঁহারা কদাপি মৎস্যমাংস আহার করেন না। তাঁহারা সামান্য একটু

দুগ্ধ, তদভাবে ফলমূল, তদভাবে বৃক্ষপত্র আহার করিয়াই জীবনধারণ করেন।

বাসনাবীজকে সম্পূর্ণরূপে দগ্ধ করিবার জন্যই তাঁহারা কিছুদিন শরীর রক্ষা করিয়া থাকেন, অর্থাৎ প্রকৃতির অনুগমন করেন। ফলতঃ শরীরের প্রতি তাঁহারা নিতান্ত উদাসীন হইয়া থাকেন। তথাপি তাঁহারা বিবেকবিহীন হইয়া শরীর রক্ষার জন্য যথেচ্ছ খাদ্য গ্রহণ করেন না।

পরমহংসগণ সম্পূর্ণরূপেই জনসংস্রব পরিত্যাগ করেন; তাঁহারা গ্রাম্য আহার ত্যাগ করেন। আরণ্য ফলমূলাদি তাঁহাদের জীবনোপায়। জনসাধারণের সুখদুঃখে তাঁহাদের সহানুভূতি নাই; তাঁহাদের দয়ামায়া প্রভৃতি সামাজিক ধর্ম্মও নাই; সুতরাং তাঁহারা সংসারের অতীত এবং সাংসারিক লোকের পক্ষে নিতান্ত অকার্য্যকর। অতএব পরমহংসগণের আচরণ সামাজিক সাধারণ মনুষ্যের অননুকরণীয়। সমাজে যাঁহারা অপেক্ষাকৃত সত্ত্বগুণপ্রধান,শুদ্ধাচারসম্পন্ন এবং জ্ঞানসম্পন্ন, তাঁহারাই মহাজন বলিয়া খ্যাত; সেই সকল মহাজনের পন্থাই সাধারণের পক্ষে অনুসরণ করা কর্ত্তব্য। সেই মহাজনগণই সাধারণতঃ দেবতা বলিয়া পূজিত। যেহেতু তাঁহারা সাংসারিক দুঃখে পীড়িত নহেন, বরং সাংসারিক বিবিধ আনন্দে ও সুখে তৃপ্ত। সাংসারিক তদ্রূপ সুখের ও আনন্দের অবস্থাই সাধারণতঃ স্বর্গ বলিয়া খ্যাত। সেই স্বর্গসুখের জন্যই সাধারণতঃ সামাজিক লোকে বিব্রত। অতএব সেই স্বর্গীয় সুখ উপভোগের জন্যই সাধারণ জন-

গণের পক্ষে মহাজনগণের বা দেবতাদের পথ অনুসরণ করা কর্ত্তব্য।

কিন্তু যথার্থ পরমহংসগণ দেবতা অপেক্ষাও উচ্চপদস্থ। তাঁহারা সুখেও বিতৃষ্ণ, স্বর্গভোগের অভিলাষও তাঁহাদের নাই। অতএব এরূপ উন্নতাত্মাদের আচরণ অনুকরণ করা দেবতাদেরই পক্ষে কঠিন, সুতরাং সাধারণ জনগণের পক্ষে তাহা অসাধ্য বলিলেই হয়।

৩১ প্র। সংসারে অদ্যাপি ত বিস্তর পরমহংস দৃষ্ট হয়। তাঁহারা ত জনসাধারণের হিতকামনায় সতত চেষ্টাও করিয়া থাকেন?

উ। তাঁহারা যথার্থ পরমহংস নহেন। সমাজের হিতকামনা যাঁহাদের আছে, তাঁহারা সামাজিক উন্নতপ্রকৃতির লোক। তাঁহারা অবশ্য মহাজন বলিয়া আখ্যাত হইবার উপযুক্ত। তাঁহারা জনসাধারণের দুঃখে দয়ার্দ্র হইয়া তাহাদের দুঃখ দূরীকরণে সচেষ্ট হইয়া থাকেন। এবং তাঁহারা আপনারা যে উপায়ে সংসার-দুঃখের শান্তি করিয়া সাংসারিক সুখের অবস্থা বা স্বর্গসুখের অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছেন, জনসাধারণকে সেই উপায় শিক্ষা দিয়া থাকেন।

আবার এ সংসারে ভণ্ড প্রতারকগণও সহজে উদর পূরণের জন্য ও বাসনার তৃপ্তিসাধন জন্য নিরীহতা বা নিস্পৃহতা প্রদর্শন করিয়া আপনাদিগকে সাংসারিক দুঃখমুক্ত বলিয়া ভাণ করে; কিন্তু প্রকৃতপ্রস্তাবে তাহাদিগকে বিড়ালতপস্বী বলাই সঙ্গত।

যাহা হউক, জানিয়া রাখ যে, যথার্থ পরমহংসগণ বিড়ালতপস্বী নহেন। তাঁহারা দেবতাদেরও পূজনীয়।

অধিক আর কি বলিব, যে অবস্থায় ব্যাসদেব মহাভারত লিখিয়াছিলেন, যে অবস্থায় বাল্মীকি রামায়ণ প্রচার করিয়াছিলেন, যে অবস্থায় শুকদেব রাজা পরীক্ষিৎকে উপদেশ দিয়াছিলেন, তদবস্থাতেও ব্যাস-বাল্মীকি-শুক-দেবও পরমহংসত্ব প্রাপ্ত হন নাই।

ফলতঃ সংসারের সহিত যাঁহার প্রায় কোন সম্পর্কই নাই, তিনিই পরমহংস। পরমযোগীই পরমহংস বলিয়া অভিহিত।

পরিশেষে তোমাকে সতর্ক হইবার জন্য এ কথাও বলিতেছি যে, সংসারে যাহারা আপনারা পরমহংস বা সন্ন্যাসী উপাধি গ্রহণ করিয়া মৎস্যমাংসাদি আহার করে এবং স্ত্রীসহবাস করে, তাঁহারা কদাপি বিশ্বাসভাজন নহে। কেননা তাহারা ভেকধারী ও মিথ্যাবাদী। তাহারা মুখে শতসহস্র নীতিবিষয়ক ও ধর্ম্মবিষয়ক উপদেশ দিলেও তাহাদিগকে পাষণ্ড ও নাস্তিক বলিয়া অবধারিত জানিবে। যেহেতু যাহারা আপনারা স্লেচ্ছাচার পশু পাষণ্ডের ন্যায় ব্যবহার করিয়া অন্যকে সদাচারসম্পন্ন হইতে উপদেশ দেয়, তাহাদের হৃদয়ে ভক্তি ও বিশ্বাসের লেশমাত্র নাই, সুতরাং তাহারাই যথার্থ নাস্তিক নামের উপযুক্ত পাত্র। এরূপ নাস্তিকদিগের দ্বারা সমাজের অশেষ অহিত হইয়া থাকে। সাধারণ লোকে তাহাদিগকেই "মহাজন" মনে করিয়া তাহাদেরই আচরণের অনুকরণে প্রবৃত্ত হয়; এবং পরিশেষে অশেষ দুঃখভোগ করিয়া থাকে।

৩২ প্র। তান্ত্রিক বীরাচার বা মৎস্য-মাংস-মদ্য-মুদ্রা-মৈথুনরূপ পঞ্চ-মকার সাধন সম্বন্ধে আপনার অভিপ্রায় কিরূপ ?

উ। ঘোর রাজ্যবিপ্লব হইলে, সমাজ-বিপ্লব ঘটিয়া থাকে; তখন সামাজিক শৃঙ্খলা ছিন্নভিন্ন হইয়া যায়; সুতরাং লোক সকলও নিতান্ত উচ্ছৃঙ্খল হইয়া যথেচ্ছ ব্যবহার করে। এই বিষম সঙ্কট-সময়ে ধর্ম্মাধর্ম্ম কর্ম্মাকর্ম্ম জ্ঞান বিলুপ্তপ্রায় হয়। এই সময় অপেক্ষাকৃত জ্ঞানী ও চিন্তাশীল ব্যক্তিরা পুনরায় সমাজ-শৃঙ্খলা স্থাপন করিয়া লোকদিগকে ধর্ম্মানুসরণে প্রবৃত্ত করাইবার জন্য বিবিধ চেষ্টা করিয়া থাকেন। তাঁহাদের সেই চেষ্টার ফলেই নানাপ্রকার ধর্ম্মপথের আবিষ্কার হয়। তান্ত্রিক বীরাচার বা পঞ্চ-মকারাদি সাধনও এইরূপ একটী ধর্ম্মপথ। এক্ষণে উদাহরণ দিয়া এইটী স্পষ্ট বুঝাইয়া দিতেছি।

ভারতবর্ষে হিন্দুরাজত্ব বিলুপ্ত ও মুসলমানরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইলে আর্য্যধর্ম্মের প্রভাব বিলুপ্তপ্রায় হইয়াছিল; তখন সাধারণ লোকসকল দুরাচার হইয়া পড়িল। ভগবান্ চৈতন্যদেব ভারতের এই দুর্দ্দশা পর্য্যালোচনা করিয়া জনগণের উদ্ধার-সাধনার্থ স্বয়ং সন্ন্যাস অবলম্বন করিয়া গৃহস্থগণের দ্বারে দ্বারে সদাচার-মাহাত্ম্য ও ভক্তিমাহাত্ম্য প্রচার করিতে লাগিলেন। তিনি লোকদিগকে মৎস্য-মাংস ত্যাগ করিয়া ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিতে বলিলেন এবং হরিনাম জপ করিবার উপদেশ দিলেন। কিন্তু অধিকাংশ লোকই তাঁহার উপদেশ অতি কঠোর বলিয়া অসাধ্য বিবেচনা করিল। চৈতন্যদেব তাঁহাদের

দুর্ব্বলতা হৃদয়ঙ্গম করিয়া হতাশ হইয়া পড়িলেন, তখন তাঁহার প্রিয় সহচর নিত্যানন্দ প্রভু বীরাচারের পথ অবলম্বন করিয়াই লোকদিগকে এইরূপ উপদেশ দিতে লাগিলেন ; যথা,—

"মাগুর মাছের ঝোল
নবযুবতীর কোল
হরি হরি বোল।"

অর্থাৎ তোমরা মৎস্য আহার কর, স্ত্রীসহবাসও কর, সেই সঙ্গে হরিনামও কর।

প্রভু নিত্যানন্দের উপদেশই বীরাচারের দৃষ্টান্ত। আর ভগবান্ চৈতন্যদেবের উপদেশই পশ্বাচারের দৃষ্টান্ত।

যাহারা রজোগুণে অত্যন্ত উন্মত্ত এবং তমোগুণে অত্যন্ত বিমূঢ়, তাহাদের পক্ষেই চিন্তাশীল জ্ঞানীরা বীরাচার প্রশস্ত বলিয়া মনে করিয়াছিলেন।

উপদংশরোগগ্রস্ত পাপী যন্ত্রণার আশু উপশমের জন্য পারদবিষ ভক্ষণ করিয়া থাকে। সেই পারদ যখন সর্ব্বাঙ্গে স্ফুটিত হইয়া অসহ্য যন্ত্রণাদায়ক কুষ্ঠরূপে পরিণত হয়, তখনও আবার চিকিৎসকেরা রোগীকে সেই পারদ-বিষই অন্যান্য বস্তুর সহিত মিশ্রিত করিয়া সেবন করাইয়া থাকেন।

যখন ভারতবর্ষে ঘোরতর রাজবিপ্লব জন্য মৎস্যমাংস-মদ্য-মুদ্রা-মৈথুনরূপ পঞ্চ-মকার-স্রোত অতি প্রচণ্ড-বেগে বহিতেছিল, যখন লোকে উন্মত্ত মাতঙ্গের ন্যায়

প্রবৃত্তির অধীন হইয়া যথেচ্ছাচার করিত, তখনই কোন স্বদেশপ্রেমিক চিন্তাশীল জ্ঞানী সাধারণের হিতের জন্য বীরাচার-তন্ত্রের সৃষ্টি করিয়া পঞ্চ-মকার-সমন্বিত সাধনার পথ আবিষ্কার করিয়াছিলেন।

ফলতঃ মানব-প্রকৃতি হইতে অত্যন্ত অধোগত নীচ পামরগণের পক্ষে বীরাচার ও পঞ্চ-মকারসমন্বিত সাধনাই হিতকর। যেহেতু এই সাধনার প্রভাবে তাহারা জন্মান্তরে অপেক্ষাকৃত উন্নত প্রকৃতি লাভ করিতে পারে।

৩৩ প্র। তবে কি পঞ্চ-মকারসমন্বিত বীরাচার সাধনে এক জন্মে মুক্তিলাভ করা যায় না?

উ। মুক্তি নিতান্ত সহজলভ্য মনে করিও না। বীরাচারের কথা দূরে থাক্, পশ্বাচার-সাধনেও একজন্মে মুক্তিলাভ হয় না। অধিক আর কি বলিব, আজন্ম ভগবদ্ভক্ত ধ্রুব-প্রহ্লাদও ভক্তি-মাহাত্ম্যেও একজন্মে মুক্তিলাভ করিতে পারেন নাই। ফলতঃ যতদিন আন্তরিক বাসনাবীজ সম্পূর্ণরূপে দগ্ধ ও বিনষ্ট না হয়, ততদিন কাহারও মুক্তি নাই। ধ্রুবপ্রহ্লাদকেও বাসনাবশে কত সহস্র বৎসর রাজ্যপালন ও স্বর্গভোগ করিতে হইয়াছিল। মনুষ্যের পরমায়ুঃ সত্য-ত্রেতা দ্বাপর-কলি সর্ব্বকালই শতবর্ষমিত; সুতরাং ধ্রুব-প্রহ্লাদ কখনই একই জন্মে একই স্থূলদেহে বহু সহস্র বৎসর রাজ্যপালন করেন নাই। তাঁহারাও অনেক জন্মপরিগ্রহ করিয়াছিলেন, বুঝিতে হইবে।

৩৪ প্র। পরমহংসগণও কি পুনরায় জন্মগ্রহণ করেন?

উ। না। যথার্থ পরমহংস যাঁহারা, তাঁহারাই কেবল জন্মান্তর পরিগ্রহ অর্থাৎ পুনরায় স্থূলদেহ পরিগ্রহ করেন না। ফলতঃ পরমহংসগণের জন্মই যথার্থ জন্ম, এবং তাঁহাদেরই মরণ যথার্থ মরণ। যে ব্যক্তি মরিয়া পুনরায় জন্মিবে এবং পুনরায় মরিবে, তাহার জন্মমৃত্যু নগণ্য বা তুচ্ছ। ধ্রুব-প্রহ্লাদের ন্যায় ভক্ত অথবা কপিলের ন্যায় যোগী বহু-সহস্র জন্ম পরিগ্রহের অন্তে পরমহংসত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। এইবার পরমহংস কাহাকে বলে হৃদয়ঙ্গম কর।

৩৫ প্র। ভগবন্, ধ্রুব-প্রহ্লাদ-কপিলও যদি বহু সহস্র জন্ম পরিগ্রহ করিয়া থাকেন, তবে ত আমাদের মুক্তির আশা করাই বিড়ম্বনা।

উ। বৎস, বহু সহস্র বৎসর বলিলে তুমি কি সুদীর্ঘ সময় বলিয়া মনে করিতেছ? সহস্র বৎসরের সহিত এক মুহূর্ত্তেরও অনুপাত আছে; কিন্তু অনন্ত সময়ের সহিত কোটি কোটি বৎসরেরও অনুপাত নাই! এ কথা কি হৃদয়ঙ্গম করিতে পার না? এই সকল ভাব হৃদয়ঙ্গম করাইবার জন্যই পৌরাণিক মহাত্মারা মহর্ষি লোমশ প্রভৃতির উদাহরণ দিয়া গিয়াছেন। সেই সকল পাঠ করিয়া তাহাদের তাৎপর্য্য বোধ করা কর্ত্তব্য।

৩৬ প্র। ভগবন্, মানুষের মৃত্যু হইলেই ত সূক্ষ্মদেহ স্থূলদেহ ত্যাগ করিয়া প্রাকৃতিক নিয়মেই ঊর্দ্ধগামী হইয়া থাকে; যেহেতু সেই সূক্ষ্মদেহ পার্থিব বায়ু অপেক্ষাও লঘুতর; অতএব সেই সূক্ষ্মদেহ আবার কিরূপে এই জগতে স্থূলদেহ গ্রহণ করে?

উ। বৎস, প্রাকৃতিক নিয়মে সূক্ষ্মদেহের ঊর্দ্ধগতি হইবারই কথা বটে; কিন্তু সেই দেহে বাসনারূপ অতি প্রবল

ইচ্ছাশক্তি বিদ্যমান থাকে বলিয়াই সে দেহ এই নারকীয় স্থূল জগতেই যেন আবদ্ধ হইয়া থাকে এবং সেই বাসনা-সংস্কারবশেই পুনরায় স্থূলদেহ প্রাপ্ত হয়।

৩৭ প্র। ক্ষুধাতৃষ্ণা প্রভৃতি প্রাকৃতিক অভাবের জন্যই স্থূলদেহধারীরা আর্ত্ত বা কাতর হইয়া সেই সকল অভাবমোচনের জন্যই ব্রিব্রত হইয়া থাকে, এবং সেই অভাবমোচনের জন্যই বিবিধ বাসনার বশে কার্য্য করে; কিন্তু সূক্ষ্ম-দেহধারীদের ত ক্ষুধাতৃষ্ণা প্রভৃতি প্রাকৃতিক কোন অভাবই থাকে না, তবে কেন তাহারা বাসনার বশীভূত হয়?

উ। বৎস, এই স্থানেই মায়ারহস্য অতীব বিচিত্র। সূক্ষ্ম-দেহের জন্য পার্থিব খাদ্যপানীয়ের কোন প্রয়োজন নাই, সুতরাং কোন অভাবই নাই বলিলে হয়; কেননা যাহার ক্ষুধাতৃষ্ণা নাই, তাহার অভাব কিসের? কিন্তু পার্থিব সংস্কারবশে সূক্ষ্মদেহধারীরাও ক্ষুৎপিপাসায় কাতর হইয়া থাকে! স্থূলদেহ ত্যাগ করিবার পরেও তাহারা মায়া ত্যাগ করিতে পারে না; তাহারা যে সূক্ষ্মদেহ ধারণ করিয়াছে, পূর্ব্বে তাহাদের যে স্থূলদেহ ছিল, এক্ষণে তাহা পরিত্যক্ত হইয়াছে, এ স্মৃতিও তাহাদের থাকে না; ফলতঃ যেমন মনুষ্যেরা পূর্ব্বজন্ম-বৃত্তান্ত সমস্ত বিস্মৃত হয়, তেমনই সূক্ষ্মদেহধারীরাও স্থূলদেহের বিষয় বিস্মৃত হয়; কিন্তু সেই স্থূলদেহের সমস্ত সংস্কারই তাহাদের থাকে। তাহারাও সময়ের গতি অনুভব করিয়া যথাকালে সমস্ত মানবীয় ক্রিয়াই করিয়া থাকে। তাহাদের রাগ-দ্বেষাদি সমস্তই বর্ত্তমান থাকে। স্থূলদেহ না থাকিলেও তাহারা গ্রীষ্মকালে উত্তাপ এবং শীতকালে শীত বোধ করে।

স্থূলদেহধারী মানবগণ স্বপ্নে যেমন ক্রিয়া নিষ্পন্ন করে, তদ্রূপ তাহারাও খাদ্য আহরণ করে, পাক করে, আহার করে, বিশ্রাম করে, নিদ্রা যায়, মৈথুনক্রিয়াও করে, মলমূত্র ত্যাগও করে! অথচ তাহাদের এই সমস্ত ক্রিয়াই মানসিক কল্পনামাত্র। ফলতঃ এই বিদেহ প্রেতগণের যাবতীয় ব্যাপারই বেদান্তবর্ণিত মায়াবাদের অতি প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্তস্থল।

স্থূলদেহের যাবতীয় সংস্কারই তাহাদের বিদ্যমান থাকে। সেই সংস্কারবশেই অব্যক্ত প্রাকৃতিক নিয়মে তাহাদের পুনরায় সংসারভোগ হইয়া থাকে।

কিন্তু যাঁহাদের পার্থিব বাসনার বিলয় হয়, তাঁহারাই ঊর্দ্ধগতি প্রাপ্ত হন এবং তদনন্তর তাঁহারা যে কিরূপ অবস্থাপন্ন হন, তাহা মনুষ্যবুদ্ধির অতীত, অধিক কি তাহা যোগীদিগেরও দিব্যজ্ঞানের অতীত।

৩৮ প্র। প্রেতাত্মারা স্থূল জগতের ব্যাপার সমস্ত দর্শন করিতে পারে কি না? স্থূল জগতের সহিত তাহাদের কিরূপ সম্বন্ধ থাকে?

উ। প্রেতাত্মারা স্থূলদেহধারীদিগের স্থূলদেহ দেখিতে পায় না, কিন্তু সূক্ষ্মদেহ দেখিতে পায়। সেই সূক্ষ্মদেহকে তাহারা আপনাদের মতই মনে করে।

সেই সূক্ষ্মদেহের সংস্কার বা প্রকৃতি অনুসারেই তাহারা কাহারও প্রতি অনুরক্ত ও কাহারও প্রতি বিরক্ত হইয়া থাকে। ফলতঃ মনুষ্যদিগের অন্তঃকরণ এই প্রেতগণের দ্বারা আবিষ্ট হইয়া থাকে এবং সেই আবেশবশে লোকে অনেক কার্য্যই করে।

৩৯ প্র। স্থূলদেহধারী কোন মনুষ্য, প্রেতের সূক্ষ্মদেহ দেখিতে পায় কি না?

উ। স্থূলদেহধারীরা স্থূলদৃষ্টিতে সূক্ষ্মদেহ দেখিতে পায় না। তবে যখন মন অত্যন্ত একাগ্র হয়, এবং স্বীয় স্থূলদেহ যেন এককালে ভুলিয়া যায়, তখন দর্পণস্থ প্রতিবিম্বের ন্যায় অত্যল্পক্ষণের জন্য কখন কখন সূক্ষ্মদেহ মানসনেত্রে প্রতিফলিত দেখিতে পায় এবং তৎক্ষণাৎ চক্ষু উন্মীলিত করিলেই ক্ষণকাল সেই মূর্ত্তি যেন স্থূল চক্ষুতেও প্রতিফলিত দেখিতে পায়।

মৃত্যুকালে অত্যন্ত প্রণয়াস্পদ কোন ব্যক্তি যদি বিদেশে থাকে, তবে মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই মৃত ব্যক্তির প্রেতদেহ সেই দূরস্থ আত্মীয়ের নিকট উপস্থিত হয়; সেই সময় যদি সেই আত্মীয় ব্যক্তিও উক্ত প্রণয়াস্পদের চিন্তায় একাগ্র হইয়া থাকেন, তাহা হইলে সেই প্রেতমূর্ত্তি উল্লিখিতরূপে দেখিতে পান। এরূপ প্রেতদর্শন লোকের সর্ব্বদাই ঘটিয়া থাকে।

নানাবিধ পৈশাচিক যোগপ্রক্রিয়া দ্বারাও প্রেতদেহ দৃষ্টিগোচর করা যায়; এমন কি প্রেতগণকে বশীভূত করিয়া নানাপ্রকার পার্থিব কার্য্যও সাধন করা যায়।

৪০ প্র। স্থূলদেহধারীরা প্রেতগণকেও বশীভূত করিতে পারে?

উ। হাঁ পারে। সামান্য সাধনাদ্বারাই লোকে পিশাচসিদ্ধি বা প্রেতসিদ্ধি লাভ করিয়া থাকে। কিন্তু সেই সাধনা দ্বারা, পারমার্থিক হিত সাধিত হয় না, লৌকিক কার্য্য সাধন করা যায়। অতি নীচ রজস্তামসিক যোগীরাই সেই পিশাচসিদ্ধি লাভে যত্নবান্ হইয়া

থাকে। এবং সেই সিদ্ধি লাভ করিয়া তাহারা পরিণামে অত্যন্ত অধোগত হইয়া থাকে। "মারণ-উচাটন-বশীকরণ" প্রভৃতি তান্ত্রিক ক্রিয়া সেই নীচ যোগসাধনেরই ফল। অতএব পরমার্থপরায়ণ কোন ব্যক্তির পক্ষেই সেই যোগসাধনে তৎপর হওয়া কর্ত্তব্য নহে।

৪১ প্র। "তবে ত লোকে প্রেতসিদ্ধি লাভ করিয়া অনায়াসে সসাগরা ধরণীর আধিপত্য লাভ করিতে পারে? কেননা যে ইচ্ছামাত্রে যাহাকে তাহাকে প্রেতদ্বারা নিহত করাইতে পারে, বশীভূত করিতে পারে, এবং সমস্ত রাজার রাজভাণ্ডার স্বায়ত্ত করিতে পারে, তাহার পক্ষে কিছুই ত অসাধ্য থাকে না?

উ। না; লোকে প্রেতের সাহায্যে তাদৃশ উন্নতিলাভ করিতে পারে না। যেমন দুই চারি জন দুষ্ট লোকের সাহায্যে অন্যের অপকার বা নিজের সামান্য উপকারই সাধন করাইতে পারে, প্রেতের সাহায্যেও তদ্রূপ সামান্য উপকারই প্রাপ্ত হইতে পারে। স্মরণ রাখিও যে, প্রেত-লোকেও রাজা ও রাজকর্ম্মচারী পুলিশ-পাহারা প্রভৃতি আছে, সেখানেও আইন-আদালত আছে, সুতরাং সে রাজ্যেও কাহারও যথেচ্ছাচার করিবার সুযোগ নাই। সেখানেও ভয় আছে।

তোমার ধনাগারের ধন কেবল যে তুমিই রক্ষা করিয়া থাক, এরূপ মনে করিও না; সেই ধনেরও অধিষ্ঠাত্রী দেবতা বা পিশাচ আছে; সুতরাং তোমার ধন কোন পিশাচ অপহরণ করিতে চেষ্টা করিলেই প্রেতরাজ্যেও হুলস্থুল পড়িয়া যাইবে; সেখানেও তুমুল সংগ্রাম উপস্থিত হইবে।

৪২ প্র। প্রেত ও পিশাচ কাহাকে বলে? উহাদের মধ্যে কোন প্রভেদ আছে কি না?

উ। প্রেত শব্দের অর্থ স্থূলদেহপরিত্যক্ত বা মৃত অথবা পরলোকগত। আর পিশিত শব্দের অর্থ মাংস; তজ্জন্য পিশাচ শব্দের যৌগিক অর্থ মাংসভোজী অর্থাৎ মাংস যাহাদের প্রিয় খাদ্য; কিন্তু যাহারা মাংসাশী বা মাংস যাহাদের প্রিয় খাদ্য, তাহারা বিবিধ কুপ্রবৃত্তিপ্রবণ হইয়া থাকে; তজ্জন্যই পিশাচ শব্দের যোগরূঢ় অর্থ—যাহারা অত্যন্ত কুপ্রবৃত্তিপ্রবণ। পিশাচ শব্দে অত্যন্ত কুপ্রবৃত্তি-প্রবণ জীবিত বা প্রেত উভয়বিধ মনুষ্যই বুঝায়। তবে সচরাচর পিশাচ বলিলে কুপ্রবৃত্তিপ্রবণ প্রেতই বুঝাইয়া থাকে।

প্রেতমাত্রেই পিশাচ নহে; প্রেতের মধ্যেও সত্ত্বগুণ-প্রধান ব্যক্তি আছে; তাহারা দেবতুল্য।

৪৩ প্র। শাস্ত্রে ব্রাহ্মণের পক্ষে মাংসভোজন নিষিদ্ধ বটে, কিন্তু ক্ষত্রিয়ের পক্ষে ত মাংসভোজন নিষিদ্ধ হয় নাই?

উ। সামাজিক শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য রাজজাতির বা ক্ষত্রিয়ের প্রয়োজন। দুষ্টের দমন করিতে ও শিষ্টের পালন করিতে হইলেই সংসারে আসুরিক বা পৈশাচিক বলের প্রয়োজন। সেই জন্যই ক্ষত্রিয়ের পক্ষে মাংসভোজন বিহিত হইয়াছে। মনুষ্যের মধ্যে এই ক্ষত্রিয়জাতি সিংহব্যাঘ্রাদির ন্যায় বলশালী ও হিংসাপরায়ণ। অবিরত যুদ্ধবিগ্রহ কার্য্যে ইহারা লিপ্ত; সুতরাং রাজসিক প্রকৃতিই ক্ষত্রিয়ের উপযুক্ত। মাংসভোজনে সেই প্রকৃতিই পরিপুষ্ট হইয়া থাকে।

৪৯। প্র। তবে কি পশ্বাচার মনুষ্যমাত্রের পক্ষেই বিহিত নহে?

উ। বেদপাঠ করা মনুষ্যমাত্রেরই কর্ত্তব্য বটে, কিন্তু যে বালকের বর্ণজ্ঞান হয় নাই, তাহার পক্ষে বেদপাঠের ব্যবস্থা করিব কিরূপে? কোন উচ্চস্থানে উঠিতে হইলে যেমন সোপান-পরম্পরা অবলম্বন করা আবশ্যক, তেমনই জীবনের উন্নতির পক্ষেও সোপান-পরম্পরা অবলম্বন করা আবশ্যক। উন্নতি আবশ্যক বলিয়া নিম্নভূমি হইতে লম্ফপ্রদান করিয়া উন্নত হইবার চেষ্টা করা বিড়ম্বনা মাত্র।

ফলতঃ অধিকারীভেদে উন্নতি-পথের সোপান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। জ্ঞান-বৈরাগ্য নিতান্ত সুলভ নহে। বহুজন্ম ব্যাপিয়া সংসার-ক্লেশে ক্লিষ্ট হইয়াও অনেকের জ্ঞান-বৈরাগ্য জন্মে না; সুতরাং তাহাদের পক্ষে আরও জন্ম-গ্রহণ করিয়া সাংসারিক ক্লেশে নিপীড়িত হওয়া আবশ্যক; ইহাই প্রাকৃতিক নিয়ম। তাহাদের পক্ষে বীরাচারের ব্যবস্থাই হিতকর।

কিন্তু যাহারা সংসারের দুঃখ সম্যক্ পর্য্যালোচনা করিয়া জ্ঞান-বৈরাগ্যের অধিকারী হইয়াছে, তাহাদের পক্ষেই পশ্বাচার বিহিত।

কল্পনাক্ষেত্র হইতে কার্য্যক্ষেত্র অত্যন্ত স্বতন্ত্র। এ সংসারে সর্ব্বলোকের পক্ষে পালনীয় আচার বা বিধান কেহই নির্দ্দেশ করিতে পারে না। যদি বেদান্তবিৎ ব্রাহ্মণ-গণের হস্তে এই সংসারের শাসনভার অর্পিত হয়, তবে অত্যল্পদিনের মধ্যেই সমাজশৃঙ্খলা সুরক্ষিত থাকা নিতান্ত

অসম্ভব হইয়া পড়ে। সমাজের সহিত সংসার ধ্বংস করাই যাহাদের উদ্দেশ্য, তাহারা কি সমাজ-রক্ষায় যত্নবান্ হইতে পারে? কিন্তু অনাদি অনন্ত সংসার-মায়া কি বেদান্তবিৎ ব্রাহ্মণের যত্নে কখনও ধ্বংস হইতে পারে? অতএব যাহার পক্ষে যাহা আবশ্যক, তাহার পক্ষে তৎপ্রাপ্তির চেষ্টাই সঙ্গত ও বিধেয়। যে রাজসিক ও তামসিক প্রকৃতি সংসারের সুখ প্রার্থনা করে, সে সেই সুখ অন্বেষণ করুক্; সে সেই সুখভোগ করিয়া তৃপ্তিলাভ করিতে চেষ্টা করুক্। প্রকৃতি তাহাকে লক্ষ লক্ষ সুখের সামগ্রী প্রদর্শন করিবেন, তাহাকে সুখের লোভে বিব্রত করিবেন। কিন্তু পরিণামে তাহাকে দুঃখে নিপীড়িত করিয়াই শিক্ষা দিবেন,—তাহার চৈতন্যোদয় করাইবেন। ফলতঃ যে ব্যক্তি অতিবেগে ধাবিত হইতেছে, তাহার সম্মুখে বেগে উপস্থিত হইয়া তাহাকে স্থির করিতে যাওয়া উচিত নহে; কেননা তদ্রূপ করিলে বিষম ধাক্কা লাগিয়া উভয়েরই বিষম আঘাত সহ্য করিতে হইবে। প্রকৃতি তজ্জন্য কাহারও প্রবল বেগ হঠাৎ নিবারণ করেন না। অতএব কাহারও প্রবৃত্তির প্রবল বেগ হঠাৎ নিবারণ করিতে যাওয়া কর্ত্তব্য নহে; কেননা তাহা অপ্রাকৃতিক বা অস্বাভাবিক বলিয়া গর্হিত।

মনুষ্য সর্ব্বজীবের শ্রেষ্ঠ; তাই বলিয়া যদি আমি ইচ্ছা করি, জগতের সর্ব্বজীব মনুষ্যত্ব প্রাপ্ত হউক্, তাহা হইলে আমার সঙ্কল্প নিতান্তই ব্যর্থ হইবে, যেহেতু তদ্রূপ হওয়া অসম্ভব। অতএব যে কীট আছে, তাহাকে কীটই

থাকিতে দাও, প্রকৃতিই তাহাকে পরে পতঙ্গরূপে পরিণত করিবে। এই প্রাকৃতিক পরিণতি অবিরত চলিতেছে। অনন্ত কালপ্রবাহের কোন না কোন সময়ে কীটও মনুষ্যত্ব লাভ করিবে। মনুষ্য পুরুষকারসম্পন্ন জীব হইলেও প্রাকৃতিক পরিণতিরও অধীন হইয়া চলিতেছে। অতএব হঠাৎ কাহারও অসঙ্গতরূপ পরিণতির সম্ভাবনা নাই। যাহা হউক, এ সম্বন্ধে আর অধিক বলিব না, কেননা যোগসাধন দ্বিতীয় ভাগে দৈব ও পুরুষকার সম্বন্ধে বিস্তর কথাই বলা হইয়াছে। এক্ষণে সঙ্ক্ষেপে তোমার প্রশ্নের উত্তর দিতেছি শুন ;—

পশ্বাচার বিধি শ্রবণ করিলেই যাহার তাহা হৃদ্য বলিয়া বোধ জন্মিবে, তাহারই পক্ষে পশ্বাচার পালন করা কর্ত্তব্য। যাহার প্রকৃতি পশ্বাচার পালনে উন্মুখ হইয়া আছে, তাহারই পক্ষে পশ্বাচার বিধি উপাদেয় হইবে। "যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী।" এ কথা পরীক্ষাসিদ্ধ সত্য। অতএব যে ব্যক্তির পশ্বাচারপালনে "ভাবনা" জন্মিয়াছে, সেই ব্যক্তিই পশ্বাচার পালন করিলেই সিদ্ধি লাভ করিতে পারিবে। এ সংসারে মনুষ্যের ইচ্ছাশক্তির এমনই মহিমা যে, যে একান্তচিত্তে যাহার অন্বেষণ করে, সে তাহাই সহজে পায়। তবে অজ্ঞানতা বশতঃ নির্ব্বাচনের দোষে কেহ কেহ অভিলষিত বস্তু প্রাপ্ত হইলেও অভিলাষানুযায়ি সুখ বা তৃপ্তি পায় না, কেননা মূঢ়তাবশে যে এ সংসারে "দিল্লীকা লাড্ডুর" জন্য প্রাণপণ যত্ন করে, পরিণামে তাহার আশা নিরাশায় পরিণত হয়। কিন্তু

যে ব্যক্তির নির্ব্বাচন তদ্রূপ দূষিত নহে, তাহার পক্ষে নিরাশ হইবার সম্ভাবনা নাই।

পশ্বাচার পালন করিয়া কেহই নিরাশ হইবে না। যে কেহ ইহা পালন করিবে, সেই ব্যক্তিই ইহার অমৃত-ময় ফলের অধিকারী হইতে পারিবে।

৪৫ প্র। তবে বোধকরি ব্রাহ্মণের পক্ষেই পশ্বাচার পালন করা বিহিত, অন্যের পক্ষে নহে?

উ। হাঁ, ব্রাহ্মণের পক্ষে পশ্বাচার পালন করা অবশ্যকর্ত্তব্য, কিন্তু যাহার পশ্বাচার-পালনে প্রবৃত্তি বা শ্রদ্ধা জন্মিয়াছে, সে শূদ্রকুলে জন্মিলেও পশ্বাচারপালনে তাহার অধিকার আছে। এবং সে পশ্বাচার পালন করিলেই ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিতে পারিবে। বাহ্য উপবীত ব্রাহ্মণত্বের চিহ্ন নহে; যে শৌচাচারবিহীন, সে উপবীতধারী হইলেও যথার্থ ব্রাহ্মণ নহে; কিন্তু যে ব্যক্তি শৌচাচারসম্পন্ন, সে উপবীতধারী না হইলেও ব্রাহ্মণ। ফলতঃ যাহার চিত্তমল পরিষ্কৃত হইয়াছে অর্থাৎ যাহার চিত্তশুদ্ধি হইয়াছে, যাহার চিত্ত আত্মদর্শনযোগ্য বা ব্রহ্মদর্শনযোগ্য অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে, সেই ব্যক্তিই ব্রাহ্মণ। যাহার চিত্ত রাজসিক ও তামসিক ভাবে পরিপূর্ণ, সে ব্রাহ্মণকুলে জন্মিলেও যথার্থ ব্রাহ্মণ বলিয়া গণ্য নহে।

পশ্বাচার দ্বারা শূদ্রও ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিতে পারে এবং ব্রাহ্মণ মুক্তিলাভে সমর্থ হয়।

তৃতীয় অধ্যায়।

ধ্যান ও জপ সম্বন্ধে।

৪৬ প্র। ধ্যানের প্রয়োজন কি ?

উ। মনকে স্থির করিতে পারিলে পাপপ্রবৃত্তিকে সহজেই নিবৃত্ত করা যায় এবং পাপপ্রবৃত্তির নিবৃত্তি হইলেই পরিণামে দুঃখের শান্তি করা যায় ; অতএব মনস্থির করার জন্যই ধ্যানের প্রয়োজন।

সমাধি দ্বারা যে সকল দুঃখ নিবারিণ করা যায়, তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি ; ধ্যান অভ্যাস করিতে করিতেই ক্রমে সেই সমাধি অভ্যস্ত হয়।

৪৭ প্র। ধ্যান দ্বারা মনকে স্থির করা যায় কেন ?

উ। মনুষ্যের মন বা চিত্ত একটী। সেই চিত্ত ইন্দ্রিয়গণ কর্ত্তৃক আনীত বিষয়াকার প্রাপ্ত হইয়া থাকে। অর্থাৎ চক্ষু যখন রূপের ছবি আনিয়া চিত্তে উপনীত করে, তখন চিত্ত সেই রূপের আকারই প্রাপ্ত হয় ; কর্ণ যখন কোন শব্দ চিত্ত-সমীপে উপনীত করে, তখন চিত্ত সেই শব্দরূপ পরিগ্রহ করিয়া থাকে। এইরূপেই চিত্ত রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ-শব্দের আকারে পরিণত হয়। ফলতঃ দ্রবীভূত ধাতু যেমন কোন ছাঁচে ঢালিলে সেই ছাঁচের আকারে পরিণত হয়, অথবা দ্রবদ্রব্য যেমন আধার-পাত্রের রূপ গ্রহণ করে, চিত্তও তদ্রূপে বিষয়াকার প্রাপ্ত

হয়। অতএব ধ্যান দ্বারা চিত্তকে ইষ্টদেবতার আকারেই পরিণত করা যায়; পুনঃ পুনঃ তদ্রূপ করিতে করিতে এরূপ অভ্যাস জন্মে যে, তখন মন ইচ্ছামাত্রেই অন্য বিষয় ত্যাগ করিয়া সেই মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিতে পারে। সুতরাং তখন ইন্দ্রিয়গণ সহজেই মনের বশীভূত হয়। অর্থাৎ মন তখন স্বেচ্ছাক্রমে ইন্দ্রিয়বিষয় গ্রহণ বা ত্যাগ করিবার শক্তি প্রাপ্ত হয়। ইন্দ্রিয়বিষয় স্বেচ্ছাক্রমে ত্যাগ করিবার শক্তিকেই প্রত্যাহার-শক্তি বলে। প্রত্যাহার-শক্তি জন্মিলেই অনায়াসে সমাধির অবস্থা প্রাপ্ত হওয়া যায়।

৪৮ প্র। প্রত্যাহার-শক্তি জন্মিলে সমাধির অবস্থা প্রাপ্ত হওয়া যায় এবং সমাধির অবস্থা প্রাপ্ত হইলেই পরিণাম-দুঃখের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়, এই বিষয়টী ভালরূপে বুঝিতে পারি নাই, উদাহরণ দ্বারা বুঝাইয়া দিউন্।

উ। দুঃখ পরিহার করাই সকলের প্রার্থনীয়। রজোগুণ-সম্ভূত চিত্তচাঞ্চল্যই সেই দুঃখের নিদান বা হেতু। এ কথা জ্ঞানিমাত্রেই জানেন, কিন্তু জানিলেই কোন ফল হয় না; ধ্যান-যোগ অভ্যাস না করিলে কেহই সহজে চিত্ত স্থির করিতে পারেন না; সুতরাং দুঃখ হইতেও পরিত্রাণ পান না।

অভিজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রেই জানেন যে, শরীরের বীর্য্যক্ষয় করিলেই শারীরিক অশেষবিধ পীড়া জন্মিয়া থাকে; অথচ কামিনীসম্ভোগজনিত ক্ষণিক সুখাভাসে অভ্যস্ত হওয়াতে সুন্দরী যুবতীর দর্শনমাত্রেই সেই সুখাভাসের স্মৃতি জ্ঞানীরও মনে উদিত হইয়া সেই মন ঐ যুবতীর

আকারেই পরিণত হয় এবং সেই যুবতীর সম্ভোগেই লালায়িত বা আগ্রহান্বিত হইয়া থাকে; তদবস্থায় সেই জ্ঞানীর চিত্ত হইতে জ্ঞানও তিরোহিত হয়; যেহেতু তখন তিনি বীর্য্যক্ষয়ের পরিণাম-দুঃখ স্মরণ করিয়াও বিবেক অবলম্বন দ্বারা স্বীয় মনের উত্তেজনা প্রশান্ত করিতে পারেন না, কেননা মনকে যেরূপে প্রশান্ত করা যায়, সে উপায় তিনি অভ্যাস করেন নাই। এই জন্যই মহাপণ্ডিতেরাও মহামূর্খের ন্যায় প্রলোভনের বশীভূত হইয়া দুঃখভোগ করেন।

কিন্তু ধ্যানযোগে অভ্যস্ত কোন জ্ঞানীর নয়নে সুন্দরী রমণীর মূর্ত্তি উপস্থিত হইলেই তিনি তৎক্ষণাৎ পরিণাম-দুঃখ স্মরণ করিয়া সেই সুন্দরী মূর্ত্তিকে মন হইতে প্রত্যাখ্যান করিবার জন্য অভ্যস্ত ইষ্টদেবতার ধ্যানে মনকে গঠিত করেন, তখন তিনি সহজেই কুপ্রবৃত্তি হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়া পরিণাম-দুঃখ হইতেও রক্ষা পাইয়া থাকেন।

৪৯ প্র। যে সুখাভাসের স্মৃতি ধ্যানে অনভ্যস্ত জ্ঞানীকে কামিনীর দর্শনমাত্রেই প্রলোভিত করে, সেই সুখাভাসের স্মৃতিই ত ধ্যানাভ্যস্ত ব্যক্তিকেও কামিনীদর্শনে প্রলোভিত করিতে পারে?

উ। সামান্য জ্ঞানীর বা পণ্ডিতের সহিত যোগীর বিশেষ পার্থক্য আছে। জ্ঞানবৈরাগ্যের উদয় না হইলে কেহই যোগাভ্যাসে প্রবৃত্ত হয় না। কেবল হিতাহিত জ্ঞান জন্মিলেই বৈরাগ্য জন্মে না। অতএব বৈরাগ্যের জন্যই জ্ঞানী অপেক্ষা যোগীর শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার্য্য।

জ্ঞানী ব্যক্তিরা যত সহজেই প্রলোভনের বশীভূত হইয়া থাকেন, বিষয়-বিরাগী যোগীর পক্ষে তত সহজে প্রলোভনের বশীভূত হওয়া সম্ভাবিত নহে।

সকলেই একথা জানে যে, শরীর স্থির রাখিতে পারিলেই তাহাকে জলের উপর ভাসমান রাখা যায়; কিন্তু একথা জানিলেই সকলে জলে স্বীয় শরীরকে ভাসমান রাখিতে পারে না; যাহারা অভ্যাস করিয়াছে, তাহারাই পারে। যাঁহারা অভ্যাস করে নাই; তাহারাই হাবুডুবু খাইয়া মরে।

তদ্রূপেই জ্ঞানীর জ্ঞান প্রলোভনে হাবুডুবু খাইয়া মরে; কিন্তু যোগীর জ্ঞান তদ্রূপে মরে না।

৫০ প্র। তবে বশিষ্ঠ-পরাশর প্রভৃতি মহাযোগীরা কি জন্য প্রলোভনে মোহিত হইয়াছিলেন?

উ। যে সময়ে বশিষ্ঠ ও পরাশর প্রলোভনে মুগ্ধ হইয়াছিলেন, সে সময়ে তাঁহারা মহাযোগী হইতে পারেন নাই, তাহার অনেক পরে মহাযোগী হইয়াছিলেন। ফলতঃ মহাযোগীরা কখনই সামান্য নারীরূপে মোহিত হন না।

অতৃপ্ত বাসনা অন্তরে নিহিত থাকিলে উপযুক্ত সময়ে তাহা অঙ্কুরিত হইয়া থাকে। বশিষ্ঠ-পরাশরের মনেও কামিনী-সম্ভোগের বাসনা ছিল, সেই জন্যই তাঁহারা যথাকালে প্রলোভনে মোহিত হইয়া সেই লুকায়িত বাসনার তৃপ্তিসাধন করিয়াছিলেন। কিন্তু যে সকল ভুক্তভোগী ব্যক্তি কামিনী-সম্ভোগ-বাসনা চরিতার্থ করিয়া পুনঃ পুনঃ তাহার পরিণাম-দুঃখ বিচার করিয়া যোগপরায়ণ হইয়া-

ছেন, তাঁহারা কি কখনও আবার সেই জঘন্য ক্ষণিক মোহে মুগ্ধ হইয়া থাকেন? ইহা কখনই সম্ভাবিত নহে।

৫১ প্র। কতদিন ধ্যানযোগ অভ্যাস করিলে সমাধির অবস্থা প্রাপ্ত হওয়া যায়?

উ। মহাযোগীরা বলেন,

"স তু দীর্ঘকাল-নৈরন্তর্য্য-
সৎকার-সেবিতো দৃঢ়ভূমিঃ।"

অর্থাৎ বহুদিন নিরন্তর শ্রদ্ধা সহকারে অভ্যাস করিলে সমাধির অবস্থা প্রাপ্ত হওয়া যায়। কিন্তু এই দীর্ঘকালের নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ উল্লেখ করা অসম্ভব। যেহেতু সকলের শ্রদ্ধা সমান নহে।

যে বালক মনোযোগ সহকারে পাঠ করিলে, একঘণ্টার মধ্যেই কোন পুস্তকের একশত পঙ্‌ক্তি মুখস্থ করিতে পারে, সেই বালকই মনোযোগের অভাবে দশ পঙ্‌ক্তিও দুই ঘণ্টায় মুখস্থ করিতে পারে না। অতএব যোগ-সাধনে সিদ্ধির কাল নির্ণয় করা অসম্ভব।

৫২ প্র। মনকে বহুক্ষণের জন্য কোন এক পদার্থের আকারে পরিণত করিয়া একাগ্র করাই যখন ধ্যানের উদ্দেশ্য, তখন ধ্যানের জন্য যে কোন পদার্থ অবলম্বন করিলেই ত হয়? ইষ্টদেবতার মূর্ত্তি ধ্যান করিবার প্রয়োজন কি?

উ। মনকে একাগ্র করাই ধ্যানের সাক্ষাৎ উদ্দেশ্য বটে, কিন্তু পরোক্ষ বা চরম উদ্দেশ্য নহে। কুম্ভকার মস্তকে মৃত্তিকা-ভার বহন করে কেন? তাহার উদ্দেশ্য কি? ঘটাদি নির্ম্মাণ করাই তাহার সাক্ষাৎ বা অব্যবহিত উদ্দেশ্য বটে, কিন্তু সেই ঘটাদি বিক্রয় করিয়া সে যে অর্থলাভ করিবে, সেই অর্থ দ্বারা তাহার অভিলষিত দ্রব্যাদি ক্রয় করিয়া অভাবমোচন করিবে এবং সুখসচ্ছন্দে কালাতিপাত

করিবে, ইহাই তাহার চরম উদ্দেশ্য। অতএব মৃত্তিকা-ভার বহনের চরম উদ্দেশ্য অভাবমোচন বা সুখলাভ। ধ্যানেরও চরম উদ্দেশ্য ক্লেশমুক্তি।

ক্লেশমুক্তির বা সুখপ্রাপ্তির জন্য এ জগতে সকলেই যত্নবান্। সুখপ্রাপ্তির আশাতে এ সংসারে অনেকে অনেক পদার্থের ধ্যানও করিয়া থাকে; যেমন প্রসূতি স্বীয় শিশু সন্তানের ধ্যানে নিমগ্ন; যুবা যুবতীর ধ্যানে নিমগ্ন; কামুকী উপপতির ধ্যানে মগ্ন ইত্যাদি। কিন্তু এই সকল ধ্যানে চরমে সুখলাভ বা ক্লেশমুক্তি হয় না। পিপাসার্ত্ত মৃগ যেমন মরীচিকা দেখিয়া জলপানের আশায় ধাবিত হইয়া পরিণামে কাতর হইয়া প্রাণত্যাগ করে, উক্ত ধ্যান-পরায়ণ ব্যক্তিরাও তদ্রূপ মায়াময় সুখের অভিলাষে ধ্যান-পরায়ণ হইয়া শেষে অনুতাপ ভোগ করে।

অতএব যে কোন পদার্থ অবলম্বন করিয়া মনকে একাগ্র করা যায় বটে, কিন্তু সেই একাগ্রতার চরমফল অন্যবিধ; অর্থাৎ ইষ্টদেবতার ধ্যানের চরমফল হইতে পূর্ব্বোক্ত ধ্যানের চরমফল সম্পূর্ণ বিপরীত।

জন্ম-জরা-মরণরূপ অনন্ত ক্লেশপ্রবাহের নিবারণ করাই যোগীর ধ্যানের উদ্দেশ্য। একমাত্র ইষ্টদেবতার ধ্যানেই সেই উদ্দেশ্য সমাহিত হইতে পারে, অন্য ধ্যানে তাহা পারে না। যেমন মোদকদ্রব্য-লোলুপ ব্যক্তিরা মোদকদ্রব্যের ধ্যান করিলেই তাহাদের রসনা হইতে লালা ক্ষরিত হয়, তদ্রূপ যুবকেরা যুবতীর ধ্যান করিলেই তাহাদের শোণিতকোষ হইতে বীর্য্যবিন্দু-সকল স্খলিত

হইয়া থাকে; তাহাতে যুবারা নির্বীর্য্য ও নিঃসত্ত্ব হইয়া জীর্ণ ও আশু মৃত্যুগ্রস্ত হয় এবং পুনরায় জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে।

ফলতঃ ধ্যান দুই প্রকার; প্রবৃত্তিমূলক ও নিবৃত্তি-মূলক। প্রবৃত্তিমূলক ধ্যান সংসার-যন্ত্রণায় পাতিত করে; আর নিবৃত্তিমূলক ধ্যান সংসার-নরক হইতে উদ্ধার করে। ইষ্টদেবতার ধ্যান নিবৃত্তিমূলক, আর অন্যান্য ধ্যান প্রবৃত্তি মূলক। অতএব সংসার-স্রোত হইতে যাহাদের উদ্ধারের অভিলাষ জন্মিয়াছে, তাহাদের পক্ষে ইষ্টদেবতার ধ্যান করাই একান্ত কর্ত্তব্য।

৫৩ প্র। ইষ্টদেবতা কে?

উ। যিনি একমাত্র সত্যস্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ ও অনন্তস্বরূপ, এবং যিনি সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়ের কারণস্বরূপ, সেই প্রণবরূপী ভগবানই ইষ্টদেবতা।

৫৪ প্র। তবে মৃত্তিকা-শিলাময় মূর্ত্তি অথবা বর্ণময় চিত্রপটের ধ্যান করিলে ইষ্ট-দেবতার ধ্যান করা হইবে কিরূপে?

উ। যেমন বেদান্তজ্ঞান লাভের জন্যই লোকে প্রথমে ক, খ, গ, প্রভৃতি নিরর্থক বর্ণাবলির ধ্যান করে, তদ্রূপ অনন্ত-স্বরূপের অনন্ত জ্ঞানের ভাব হৃদয়ঙ্গম করিবার উদ্দেশেই প্রথমে নিরর্থক মূর্ত্তি-পটের ধ্যান আবশ্যক।

ধ্যানের সহিত কেবল নিরর্থক জড় মূর্ত্তিপটেরই সম্বন্ধ নহে, ভাবেরও সম্বন্ধ আছে। জড় মনের একাগ্রতা সম্পা-দনের জন্যই জড় মূর্ত্তিপটের প্রয়োজন; কিন্তু উপাধি-কলুষিত জ্ঞানকে অনন্ত বিশুদ্ধ জ্ঞানে পরিণত করিবার

জন্য "ভাবের" প্রয়োজন। এই ধ্যানই সমাধির প্রাথমিক অনুষ্ঠেয়। অর্থাৎ এইরূপ ধ্যানই সমাধির "বর্ণপরিচয়" স্বরূপ।

৫৫ প্র। জড়মূর্ত্তি পরিত্যাগ করিয়া কি ধ্যান করা যায় না?

উ। না; পার্থিব জড়ময় অন্তঃকরণ জড়ের চিন্তা ব্যতীত প্রথমে অন্যবিধ চিন্তা ধারণা করিতে সমর্থ নহে। ফলতঃ অগ্রে বর্ণপরিচয় না হইলে যেমন বেদপাঠ করিয়া বেদান্ত-জ্ঞান লাভ করা অসম্ভব বা অসাধ্য, তেমনই প্রথমতঃ জড়ধ্যান ব্যতীত মনের একাগ্রতা সম্পাদন করাও অসম্ভব বা অসাধ্য।

প্রথমে ভাবসম্বলিত জড়ধ্যান আবশ্যক; পরে যখন মন সত্ত্বময় হইয়া সমাধিযোগ্য অবস্থা প্রাপ্ত হইবে, তখন ভাবধ্যান বিহিত, এই ভাবধ্যানই সবিচার সবিকল্প সমাধি বলিয়া খ্যাত। ক্রমে এই ভাবধ্যানও তিরোহিত করিয়া পরম যোগীরা মনকে নির্ব্বাত নিষ্কম্প দীপশিখার ন্যায় করিয়া সম্পূর্ণরূপে নির্ভাবনা হইয়া থাকেন, সেই সমাধির অবস্থাকেই নির্ব্বিচার নির্ব্বিকল্প সমাধি বলে। এই সমাধির নামই নির্ব্বাণমুক্তি।

৫৬ প্র। মনুষ্য কি কখনও নির্ব্বিকল্প সমাধি লাভ করিতে পারে?

উ। স্থূলদেহধারী মনুষ্যেরা যে নির্ব্বিকল্প সমাধি লাভ করিতে পারে, এ কথা আমরা মনেও ধারণা করিতে সমর্থ নহি। সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা নির্ব্বিকল্প সমাধি অবলম্বন করিলে সৃষ্টি করিতে পারেন না; বিষ্ণুও নির্ব্বিকল্প সমাধি অবলম্বন করিলে পালন করিতে পারেন না;

মহেশও নির্ব্বিকল্প সমাধি অবলম্বন করিলে প্রলয় করিতে পারেন না; অতএব যে সমাধি ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশের অসাধ্য বা অনবলম্ব্য, তাহা মানুষের সাধ্যায়ত্ত কি না, জানি না। তবে যোগশাস্ত্রে এই সমাধির উল্লেখ আছে, এইমাত্র জানি।

৫৭ প্র। নির্ব্বিচার নির্ব্বিকল্প সমাধি যদি মনুষ্যের অসাধ্য হয়, তবে সংসার-মুক্তির সম্ভাবনা কোথায়?

উ। সংসার-মুক্তির জন্য নির্ব্বিকল্প সমাধির প্রয়োজন নাই। সংসার-মুক্তি অতি সামান্য যোগীরও সাধ্যায়ত্ত। সংসার অপেক্ষা উচ্চ হইতে উচ্চতর কোটি কোটি স্থান বা পদ আছে।

সামান্য কয়েক সহস্র রজত-মুদ্রা পাইলেই যাহার অভাব মোচন হইতে পারে, তাহার পক্ষে লক্ষ কোটি স্বর্ণ-মুদ্রার প্রয়োজন কি? সেই জন্যই বলিতেছি, সংসার-নরক হইতে উদ্ধারের জন্য ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর অপেক্ষাও উচ্চতর পদের প্রয়োজন নাই।

সামান্য কৃমিকীট হইতে ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর পর্য্যন্ত সকলেই মুক্তির প্রার্থী। সকলেরই অভাব আছে; কিন্তু সকলের অভাব সমান নহে। সেই জন্যই সকলের সাধনাও সমতুল নহে।

৫৮ প্র। ব্রহ্মাবিষ্ণুমহেশও যখন অনন্ত সাগরের বুদ্বুদমাত্র, তবে কেন লোকে তাঁহাদের উপাসনা করে?

উ। মুক্তির জন্য যখন জঘন্য বা হেয় জড়েরও সহায়তা আবশ্যক, তখন মহাত্মাদিগের উপাসনা যে নিতান্তই আবশ্যক, তদ্বিষয়ে সন্দেহ কি? স্মরণ করিয়া দেখ

দেখি, শিশুকালে মাতা-পিতা তোমার হাত ধরিয়া দাঁড়াইতে ও চলিতে শিক্ষা দিয়াছিলেন। ক্ষুধার সময় আহার দিয়া তোমার প্রাণরক্ষা করিয়াছিলেন। কত বিপদ হইতে তোমার রক্ষা বিধান করিয়াছিলেন। আমিও তোমাকে কত উপদেশ দিতেছি, কিন্তু তোমার পিতামাতা-শিক্ষক-গুরু সকলেই যাঁহাদের প্রবর্ত্তনায় তোমার এইরূপ সহায়তা করিয়াছেন ও করিতেছেন, সেই জগৎপতিগণের উপাসনা না করিলে তুমি কিরূপে উন্নতিলাভ করিবে? তোমার বুদ্ধির অপেক্ষা যাঁহার বুদ্ধি অধিকতর পরিষ্কৃত, তিনিই তোমার অপেক্ষা অধিক-তর জ্ঞানী; সুতরাং তুমি তাঁহার সাহায্যে স্বীয় উন্নতি বিধান করিতে পার। কিন্তু তাঁহার অপেক্ষাও অধিক-তর জ্ঞানী আছেন; এইরূপ আপেক্ষিক জ্ঞানের উৎকর্ষ দেখিয়াই লোকে অনন্ত জ্ঞানের কল্পনা করিতে পারে। আমার ঈশ্বর আছেন, আবার আমার সেই ঈশ্বরেরও ঈশ্বর আছেন, এইরূপ ক্রম-অনুসারেই আমরা পরমেশ্বরের অস্তিত্ব প্রত্যক্ষবৎ অনুভূতির আয়ত্ত করিতে পারি।

অতএব পরমেশ্বরের উদ্দেশে যাঁহারা উপাসনা করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাদের পক্ষে ঈশ্বরপরম্পরার উপাসনা অবশ্যকর্ত্তব্য। ফলতঃ উন্নতিপথের পথিক হইতে হইলে সোপানপরম্পরা অবলম্বন করা যেমন বিহিত, তদ্রূপ পরমেশ্বরের উপাসনার জন্যই ঈশ্বরগণের উপাসনা কর্ত্তব্য।

৫৯ প্র। ঈশ্বরগণের ক্রম কিরূপে অবধারণ করিব? অর্থাৎ কোন্ দেবতার পরে কাহার উপাসনা করিতে হইবে, তাহা কিরূপে নির্ণয় করিব?

উ। তোমার আন্তরিক অভাব পর্য্যালোচনা করিলেই সেই ক্রম অবধারণ করিতে পারিবে।

শিশু ক্ষুধায় কাতর হইয়া মাগো, বাবাগো, বলিয়া রোদন করে; অতএব মা বাপই শিশুর ঈশ্বর। শিক্ষার্থী ছাত্রের পক্ষে শিক্ষকই ঈশ্বর; পারমার্থিক জ্ঞানের জন্য গুরুই ঈশ্বর। এইরূপে প্রত্যক্ষ মূর্ত্তিমান ঈশ্বরগণের নির্ণয় করা যায়। তদনন্তর সকলে স্ব স্ব অভিজ্ঞতা বা শাস্ত্রানুশীলন দ্বারা যে যে দেবতার মহিমা যেরূপ শ্রবণ করিয়াছে, সেই সেই দেবতার প্রতি তাহাদের মনের অবস্থা-অনুরূপই ভক্তি-শ্রদ্ধার উদয় হইয়া থাকে এবং সেই শ্রদ্ধা অনুসারেই কেহ বা শৈব, কেহ বা শাক্ত এবং কেহ বা বৈষ্ণব হইয়া থাকে, এই সকল ঈশ্বর "ভাবময়।" সুতরাং লোক সকল স্ব স্ব "ভাব" বা চিত্ত-প্রবণতা অনু-সারেই ঈশ্বর অবলম্বন করিয়া থাকে। ইহাই ঈশ্বর নিরূপণের স্বাভাবিক উপায় জানিবে। তুমি পুরাণাদি শাস্ত্রে যে দেবতার চরিত্র পাঠ করিয়া তদ্রূপ চরিত্রকেই উন্নত বোধ করিয়াছ, সেই দেবতার উপাসনা করিলেই তুমি স্বীয় চরিত্রের উৎকর্ষ সাধন করিতে পারিবে।

সাংসারিক দুঃখে নিপীড়িত হইয়া কেহ বা কোন দেবতাকে "হে দয়াময়" বা "হে দয়াময়ী" বলিয়া দুঃখ-নিবৃত্তির জন্য সকামভাবে সকাতরে প্রার্থনা করে; আবার কেহ বা অনন্ত দুঃখস্রোত নিবারণের জন্য কর্ম্মাশয় বা

কামনা বর্জ্জন করিয়া প্রশান্তভাবে কেবল ইষ্টদেবতার ধ্যানেই মনকে অচল করিয়া রাখিতে চেষ্টা করে, কোন রূপ প্রার্থনা বা বাসনাই করে না।

অতএব আন্তরিক ভাবই দেব-নির্ব্বাচনে সহায়তা করিয়া থাকে।

৬০ প্র। যাহার সকল দেবতার প্রতিই ভক্তি জন্মিয়াছে, তাহার পক্ষে কোন্ দেবতার ধ্যান কর্ত্তব্য?

উ। ধ্যানের জন্য যে কোন একটী দেবতার মূর্ত্তি বা ছবি নির্ব্বাচন করিতে হইবে। মন্ত্রযোগ-সাধনার জন্য একমাত্র দেবতারই ধ্যান আবশ্যক। সেই একমাত্র দেবতাকেই অনন্তদেবের প্রতিনিধি বা স্বরূপ মনে করিয়া তাঁহার প্রতিই নিয়ত ভক্তির বৃদ্ধি করা কর্ত্তব্য।

৬১প্র। বৈষ্ণব ও শৈবদিগের পরস্পর বিবাদ চিরপ্রসিদ্ধ; বৈষ্ণবেরা বিষ্ণুকেই ভক্তি করে, কিন্তু শিবকে অশ্রদ্ধা করে; শৈবগণও বৈষ্ণবদিগের নিন্দা করেন। ইহার হেতু কি?

উ। জ্ঞানী ব্যক্তিরা কোন দেবতাকেই অশ্রদ্ধা করেন না, এবং কোন সম্প্রদায়ের কোন উপাসককেই ঘৃণা করেন না। অজ্ঞান মূর্খেরাই পরস্পর বিবাদ করিয়া থাকে।

"মন্ত্রযোগের জন্য একমাত্র দেবতার ধ্যান করা কর্ত্তব্য" এইরূপ গুরূপদেশের নিগূঢ় হেতু বিবেচনা না করিয়াই শিষ্যেরা পরস্পর বিবাদ করে।

৬২ প্র। ভগবন্, ধ্যানের আবশ্যকতা বুঝিয়াছি; কিন্তু ধ্যান সহকারে মন্ত্র-জপের আবশ্যকতা কি?

উ। ধ্যান যেমন যোগের সর্ব্বাপেক্ষা সহজ উপায়, তেমনই মন্ত্রজপ প্রাণায়ামের সর্ব্বাপেক্ষা সহজ উপায়।

৬৩ প্র। প্রাণায়াম কি? প্রাণায়াম দ্বারা কি উপকার হয়?

উ। প্রাণকে আয়ত্ত করার নামই প্রাণায়াম। প্রাণই মনকে নিয়ত চঞ্চল করিয়া থাকে। প্রাণায়াম অভ্যাস করিলে সেই চাঞ্চল্য নিবারিত হয়। সুতরাং প্রাণায়াম যোগের পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা হিতকর। যেহেতু প্রাণায়াম দ্বারা অন্তঃকরণ রজোমুক্ত বা স্থির হইলেই সেই অন্তঃকরণে নির্ম্মল জ্ঞানজ্যোতিঃ প্রকাশিত হয়, তখন ক্রমশই ভক্তির বৃদ্ধি হয় এবং যোগে সমাধি লাভ করা সহজ হয়।

যোগশাস্ত্রে অন্তর্ধৌতি সম্বন্ধে যে সকল উপদেশ আছে, মন্ত্রজপ দ্বারাই সেই অন্তর্ধৌতিও হইয়া থাকে।

"অপরে নিয়তাহারঃ প্রাণান্ প্রাণেষু জুহ্বতি।"

ভগবান্ এই যে প্রাণযজ্ঞের বা প্রাণায়ামের কথা বলিয়াছেন, জপযজ্ঞই সেই প্রাণযজ্ঞ বা প্রাণায়াম জানিবে। বেদবিহিত সর্ব্বযজ্ঞ অপেক্ষাও জপযজ্ঞ শ্রেষ্ঠ বলিয়াই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন, "যজ্ঞানাং জপযজ্ঞোঽস্মি"। অতএব প্রাণায়াম বা জপযজ্ঞের উপকারিতা সম্বন্ধে আর অধিক বলা বাহুল্যমাত্র।

৬৪ প্র। জপসংখ্যার প্রয়োজন কি? একহাজার আট বার জপ না করিয়া কেহ যদি তদপেক্ষা অল্প বা অধিক সংখ্যক জপ করে, তাহাতে ক্ষতি-বৃদ্ধি কি?

উ। প্রথম যোগশিক্ষার্থীর পক্ষেই নির্দ্দিষ্ট জপসংখ্যার প্রয়োজন। নতুবা এই নিত্যক্রিয়া নিয়মিত হয় না। "আমাকে অন্যূন অষ্টোত্তর-সহস্র-সংখ্যক জপ করিতেই হইবে, না করিলে গুরুবাক্য-লঙ্ঘনজনিত প্রত্যবায়গ্রস্ত

হইতে হইবে," এইরূপ শাসনাধীন ও দৃঢ় সঙ্কল্পারূঢ় না হইলে প্রথম শিক্ষার্থীরা কখনই উন্নতিলাভ করিতে পারে না। এই জন্যই প্রথম যোগশিক্ষার্থীর পক্ষে নিয়মের অধীন হওয়া আবশ্যক।

জপসংখ্যা অধিক হইলে হানি নাই, কিন্তু অল্প হইলে অবশ্যই হানি আছে।

ফলতঃ উন্নত যোগীদিগের পক্ষে জপমালার আবশ্যকতা নাই। তাঁহাদের নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসই তখন জপ-যজ্ঞরূপে পরিণত হয়; সুতরাং তাহার সংখ্যা গণনারও প্রয়োজন হয় না

৬৫ প্র। যিনি বৈষ্ণব অর্থাৎ বিষ্ণুই যাঁহার কুলদেবতা বা ইষ্টদেবতা, তিনি বিল্বপত্র দ্বারা হোম করিলে এবং রুদ্রাক্ষমালা জপ করিলে কোন দোষ হয় কি? শৈবগণ রুদ্রাক্ষমালা ও বিল্বপত্রভক্ত এবং বৈষ্ণবগণ তুলসীমালা ও তুলসীপত্র ভক্ত বলিয়াই চিরপ্রসিদ্ধ।

উ। হোমকার্য্যের উদ্দেশ্য বিল্বপত্র দ্বারাই সুসমাহিত হয়। অতএব বৈষ্ণবগণও হোমকার্য্য বিল্বপত্র দ্বারাই সম্পন্ন করিবেন। পূজার সময়ই বৈষ্ণবগণ তুলসীপত্র ও শৈবগণ বিল্বপত্র ব্যবহার করিবেন। ফলতঃ উভয়ই পবিত্র বলিয়া জানিবে। জপ-সংখ্যার জন্য রুদ্রাক্ষ বা তুলসী-মালা স্বেচ্ছানুসারেই ব্যবহার করিতে পারেন। পদ্ম-বীজ বা স্ফটিকের মালাও ব্যবহার করিতে পারেন। অভাবপক্ষে মটরের মালাও ব্যবহার্য্য। অতএব মালা সম্বন্ধে কোনরূপ কুসংস্কার পোষণ করা অকর্ত্তব্য। তবে অবশ্য দ্রব্যগুণের প্রভেদ আছে; সুতরাং মালারও

গুণের ইতর-বিশেষ আছে, ইহা স্বীকার্য্য ; কিন্তু গলদেশে ধারণের জন্যই সে বিচার কর্ত্তব্য, জপ-সংখ্যার জন্য সে বিচার অকর্ত্তব্য।

৬৬ প্র। ভগবন্, আপনার মুখে ব্রহ্মচর্য্য-মাহাত্ম্য অতি বিস্তৃতরূপেই শুনিয়াছি, "ব্রহ্মচর্য্যসাধন" নামে দ্বিতীয় ভাগ যোগসাধনে অতি বিস্তৃতভাবেই বীর্য্যক্ষয়ের অপকারিতা এবং বীর্য্যধারণের উপকারিতা বর্ণিত হইয়াছে, তথাপি সেই কথা পুনরায় আপনার মুখে সংক্ষিপ্তভাবে শুনিতে বাসনা করি, যেহেতু সেই কথা যতবার শ্রবণ করা যায়, ততই মঙ্গল। অতএব পুনরায় ব্রহ্মচর্য্যের উপকারিতা ও বীর্য্যক্ষয়ের অপকারিতা বর্ণন করুন।

উ। বৎস, ব্রহ্মচর্য্যের মাহাত্ম্য ও উপকারিতা এবং বীর্য্যক্ষয়ের অপকারিতা যথাক্রমে সংক্ষেপে পুনরায় বর্ণন করিতেছি, অবহিত হইয়া শুন ;—

ব্রহ্মচর্য্য-মাহাত্ম্য।

অতি প্রাচীন আর্য্য-সমাজ চারি আশ্রমে বিভক্ত ছিল ; তাহার প্রথম আশ্রমই ব্রহ্মচর্য্য ; দ্বিতীয় গার্হস্থ্য, তৃতীয় বানপ্রস্থ, এবং চতুর্থ সন্ন্যাস। সংসারে মনুষ্যজন্মের সদ্ব্যবহার করিবার জন্য উল্লিখিত আশ্রম-চতুষ্টয়ের প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। আর্য্যগণ প্রথমে ব্রহ্মচর্য্য-ব্রত পালন করিয়া শাস্ত্রাধ্যয়ন ও তপঃসাধন করিতেন। সেই জন্যই তাঁহারা জগতে চিরপ্রসিদ্ধ হইয়াছেন। ব্রহ্মচর্য্যের মাহাত্ম্যেই তাঁহারা বিশুদ্ধ বুদ্ধি ও দিব্যজ্ঞান লাভ করিতেন। ব্রহ্মচর্য্যই তাঁহাদের অসাধারণ মেধা ও অসাধারণ সহিষ্ণুতার হেতু।

"ব্রহ্মচর্য্য প্রতিষ্ঠায়াং বীর্য্যলাভঃ।"

ব্রহ্মচর্য্য প্রতিষ্ঠিত হইলে বীর্য্যলাভ হয়। এখানে বীর্য্য শব্দে শুক্র, শৌর্য্য, উৎসাহ, সামর্থ্য প্রভৃতি সকলই বুঝিতে হইবে। অতএব পূর্ব্বকালে ব্রাহ্মণগণ যে অতুল প্রভাব বা যোগৈশ্বর্য্য লাভ করিতেন এবং ক্ষত্রিয়গণ যে বলবীর্য্য লাভ করিতেন, একমাত্র ব্রহ্মচর্য্যই তাহার মূল-কারণ।

মনুষ্য ভূমিষ্ঠ হইয়া অবধি যে পর্য্যন্ত বীর্য্যক্ষয় না করে, সেই অবস্থাকে তাহাদের কৌমার বলে। কৌমার যে সমগ্র মনুষ্যজীবনের পবিত্রতম ও প্রিয়তম অবস্থা, তাহা সকলেই জানে। কৌমারে মনুষ্যগণের মন সর্ব্বদাই প্রফুল্ল ও উৎসাহান্বিত থাকে; অতএব এতদ্দ্বারা স্পষ্টই প্রতীত হইতেছে যে, বীর্য্যই সত্ত্বগুণের আশ্রয়; যেহেতু সত্ত্বগুণই প্রীতি ও উৎসাহের কারণ। কুমারগণ অশেষ পরিশ্রম করিয়াও ক্লান্ত হয় না; অশেষ চিন্তা করিয়াও মস্তিষ্কের পীড়া বোধ করে না; অতএব বীর্য্যই তপঃসাধনের একমাত্র সহায়। কুমারগণ এই জগৎ যেন স্বর্গীয় নন্দন-কানন বলিয়া বোধ করে; তাহারা যাহা কিছু দেখে তাহাই সুন্দর বোধ করে; যাহা কিছু শুনে তাহাই সুশ্রাব্য মনে করে, যাহা কিছু আহার করে তাহাই সুখাদ্য মনে করে। অতএব বীর্য্যই সকল ইন্দ্রিয়ের পুষ্টিসাধক। এই বীর্য্য-মাহাত্ম্য সংক্ষেপে বলিলাম।

বীর্য্যক্ষয়ের অপকারিতা।

অধুনা বহুব্যাপী রাজবিপ্লবে ও সমাজ-বিপ্লবে, আর্য্য-সমাজের ভিত্তিস্বরূপ ব্রহ্মচর্য্য আশ্রম অন্তর্হিত হইয়াছে, সেই জন্যই এখন ভারতীয় হিন্দুগণ "আর্য্য" নামের নিতান্ত অযোগ্য হইয়া পড়িয়াছে; তাহারা ম্লেচ্ছ ও যবন-গণেরও অধম হইয়া পড়িয়াছে। ব্রহ্মচর্য্য আশ্রম অন্তর্হিত হওয়াতেই প্রাচীন আর্য্যভূমি অধুনা সর্ব্ববিধ পাপ ও সর্ব্ববিধ দুঃখের আলয় হইয়াছে।

অধুনা পূর্ব্বতন ব্রাহ্মণগণের বংশোদ্ভবগণ ব্রহ্মচর্য্য-বিহীন হইয়া সত্ত্বগুণবিহীন হইয়াছে এবং ক্ষত্রিয়বংশোদ্ভবেরা ব্রহ্মচর্য্যবিহীন হইয়া নির্ব্বীর্য্য হইয়াছে। সুতরাং পূর্ব্বে যে কারণে এই ভারতভূমি পুণ্যভূমি ও আর্য্যভূমি বলিয়া জগতে প্রথিত ছিল, এখন সেই কারণের অভাবে অর্থাৎ ব্রহ্মচর্য্যের অভাবে ভারতভূমি দাসত্বের নিলয়, শূদ্রভূমি ও পাপভূমি বলিয়া অভিহিত হইতেছে।

এখন শৈশব অতিক্রম না করিতেই বালকেরা শরীরের অপক্ক বীর্য্য ক্ষয় করিতে আরম্ভ করিয়াছে এবং তজ্জন্য চিরজীবন বলহীন, বুদ্ধিহীন, উৎসাহহীন ও চিররোগী হইয়া অশেষ ক্লেশে জীবনাতিপাত করিতেছে। দেশের অধিকাংশ লোকের এইরূপ দুর্দ্দশা হওয়াতেই ভারতভূমি পাপভূমিতে পরিণত হইয়াছে, সেই জন্যই অনাবৃষ্টি, অতিবৃষ্টি, দুর্ভিক্ষ ও মরক যেন ভারতের নিত্য-সহচর হইয়াছে।

"বীর্য্যই শরীরের" সপ্তধাতুর প্রধান ধাতু; সুতরাং

সাক্ষাৎসম্বন্ধে সেই বীর্য্য ক্ষয় করিলে শারীরিক সমস্ত ইন্দ্রিয়ই দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। আর সমস্ত ইন্দ্রিয় দুর্ব্বল হইলেই সর্ব্বসুখে বঞ্চিত হইয়া কেবল কষ্টের জীবন বহন করিতে হয়।

বীর্য্যই শরীরের ওজঃস্বরূপ বা সত্ত্বস্বরূপ ; আর সত্ত্বই অন্তঃকরণের সুখপ্রীতির কারণস্বরূপ। সুতরাং বীর্য্যক্ষয় করিলেই মনের সত্ত্বগুণ ধ্বংস হয় এবং তাহাতেই অন্তঃকরণ নীরস ও ক্লেশময় হইয়া থাকে। সেই জন্যই উৎসাহ, আনন্দ তিরোহিত হয় ; তখন মানব-জীবন পশু-জীবনের অপেক্ষাও নীচ হইয়া পড়ে।

বীর্য্যক্ষয় করিলেই শরীরের শোণিত দূষিত হইয়া পড়ে, সুতরাং তখন নানাবিধ রোগে শরীর আক্রান্ত হইয়া থাকে। আয়ুর্ব্বেদে বীর্য্যক্ষয় অধিকাংশ রোগের নিদান বলিয়া লিখিত হইয়াছে।

ফলতঃ বীর্য্যক্ষয়ের অপকারিতা সাক্ষাৎপ্রত্যক্ষ সত্য-স্বরূপ, তাহাতে সন্দেহ করিবার কিছুই নাই। গোহত্যা, ব্রহ্মহত্যা, স্ত্রীহত্যাদি মহাপাতক অপেক্ষাও বীর্য্যক্ষয় উৎকট পাতক মধ্যে গণ্য।

কামক্রোধাদি ষড়রিপুর মধ্যে কামই সর্ব্বাপেক্ষা ক্লেশ-প্রদ রিপু ; কামই সংসারাবর্ত্তের হেতু। তন্মধ্যে পাশবিক কাম আবার জঘন্যতম এবং অসহ্য দুঃখের হেতু।

যোগশাস্ত্রে লিখিত হইয়াছে ;

"সিদ্ধে বিন্দৌ মহাযত্নে কিং ন সিধ্যতি ভূতলে ?"

অর্থাৎ বীর্য্যধারণ করিলে জগতে সকল প্রকার সাধনারই ফল সহজে লাভ করা যায়।

"মরণং বিন্দুপাতেন জীবনং বিন্দুধারণাৎ।
তস্মাদতি প্রযত্নেন কুরুতে বিন্দুধারণম্॥"

বীর্য্যক্ষয়ই মৃত্যুর কারণ এবং বীর্য্যধারণই জীবনের মূল, সেই জন্য অতি যত্নসহকারে যোগীরা বীর্য্যধারণ করেন।

৭ প্র। কিন্তু ভগবন, অষ্টাঙ্গ মৈথুন ত্যাগ করা যেন অসাধ্য বলিয়াই বোধ হয়।

উ। সংসারমোহে নিতান্ত বিমূঢ় ব্যক্তিদের পক্ষে অষ্টাঙ্গ মৈথুন ত্যাগ করা অসাধ্যই বটে। অধিক কি, নানা-শাস্ত্র-পারদর্শী ও সংসার-দোষদর্শী বিচারপরায়ণ অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের পক্ষেও এই জঘন্য কামদমন অতীব দুঃসাধ্য। কিন্তু বৎস, বৈরাগ্যসম্পন্ন মুমুক্ষু ব্যক্তিদের পক্ষে, বিশেষতঃ মন্ত্রযোগীর পক্ষে অষ্টাঙ্গমৈথুন পরিত্যাগ করা অসাধ্য বা দুঃসাধ্য নহে।

ধ্যানযোগে অভ্যস্ত ব্যক্তির পক্ষে অষ্টাঙ্গ মৈথুন ত্যাগ অতি সহজসাধ্য। যেহেতু যাহার মন ইষ্টদেবতার ধ্যানেই সর্ব্বদা নিয়োজিত, জঘন্য কাম-চিন্তা সেই মনে কখন্ অধিকার লাভ করিবে? যে প্রলোভনের প্রতিও মনোযোগী নহে, প্রলোভনও তাহার মনে আধিপত্য লাভ করিতে পারে না। যাহা হউক তথাপি কি বৈরাগ্য-সম্পন্ন মুমুক্ষু, কি মন্ত্রযোগপরায়ণ সংসারী সকলেরই পক্ষে কাম-প্রলোভনের বিষয়ে বিশেষ সতর্ক থাকা

কর্ত্তব্য। এই জন্যই যোগশাস্ত্রে এইরূপ লিখিত আছে যে,—

"শ্রবণং কীর্ত্তনং কেলিঃ প্রেক্ষণং গুহ্যভাষণম্।
সঙ্কল্পোঽধ্যবসায়শ্চ ক্রিয়ানিষ্পত্তিরেব চ।
এতন্মৈথুনমষ্টাঙ্গং প্রবদন্তি মনীষিণঃ।
বিপরীতং ব্রহ্মচর্য্যমনুষ্ঠেয়ং মুমুক্ষুভিঃ॥"

সকামভাবে স্ত্রীলোকের রূপ দর্শন করিবামাত্রই বীর্য্য-ক্ষয় হয়; স্ত্রীলোকের রূপগুণাদির বর্ণনা শ্রবণ বা কীর্ত্তন করিলেও বীর্য্যক্ষয় হয়; স্ত্রীলোকের সহিত ক্রীড়া বা গোপনে কথোপকথন করিলেও বীর্য্যক্ষয় হয়; এবং রতি-ক্রিয়ার সঙ্কল্প করিবামাত্রই বীর্য্যক্ষয় হয়। কিন্তু এই সকল ক্ষয় সাক্ষাৎসম্বন্ধে দেখা না গেলেও শরীরের অভ্যন্তরে প্রথমে শোণিত-কোষ হইতে শুক্র বিচ্যুত হইয়া শুক্রাধারে আসিয়া সঞ্চিত হয় এবং পরে প্রস্রাবের সহিত বা স্বপ্নদোষসহকারে নির্গত হইয়া থাকে। ফলতঃ উক্ত অষ্টাঙ্গ মৈথুনই স্বপ্নদোষের কারণ এবং তাহাই ধাতুদৌর্ব্বল্য, মূত্রকৃচ্ছ্র, বহুমূত্র, বাত ও যক্ষ্মাকাশ প্রভৃতি যন্ত্রণাদায়ক দুশ্চিকিৎস্য রোগের নিদান।

অতএব সর্ব্বপ্রযত্নে অষ্টাঙ্গ মৈথুন পরিত্যাগে যত্নবান্ হওয়া কর্ত্তব্য। যাহাদের এই কর্ত্তব্য জ্ঞান জন্মিয়াছে, তাহারা কেবল ধ্যানযোগ অভ্যাস করিলেই সহজে সফল-মনোরথ হইতে পারে, অন্য উপায় অবলম্বনে তাদৃশ কৃত-কার্য্য হইবার সম্ভাবনা নাই।

৬৮ প্র। কিন্তু সংসারী ব্যক্তির পক্ষে ধ্যানযোগ অবলম্বন করা অতীব দুঃসাধ্য বলিয়া বোধ হয়।

উ। যাঁহারা উদাসীন বা সন্ন্যাসী, তাঁহারা সর্ব্বদাই ধ্যান-যোগে মগ্ন থাকেন বলিয়া তাঁহারা সংসারে অকর্ম্মণ্য হইয়া থাকেন। অতএব সংসারী ব্যক্তির পক্ষে সম্যক্ প্রকারে ধ্যানযোগ অবলম্বন করা দুঃসাধ্য বটে; কিন্তু রাত্রিকালে অর্থাৎ সাংসারিক যাবতীয় ব্যাপারের অবসান কালে তাঁহাদের পক্ষে ধ্যানযোগ অবলম্বন করা দুঃসাধ্য নহে। সেই জন্যই অর্থাৎ সংসারী ব্যক্তিদের জন্যই পশ্বাচার-বিধিতে কেবল রাত্রিতেই মন্ত্রযোগের ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

সাংসারিক কার্য্যাবলিই সংসারী ব্যক্তির দিবসের ধ্যেয়; সেই কার্য্যাবলি পাপকার্য্য না হইলে তাহাও সিদ্ধিপ্রদ। অর্থাৎ সাংসারিক কার্য্য-চিন্তাতে মন ব্যাপৃত রাখিলেও সে মনে জঘন্য কামচিন্তা আসিতে পারে না। সুতরাং তাহাতেও শারীরিক বা মানসিক কোন গ্লানির সম্ভাবনা নাই। যে চিন্তায় বীর্য্যক্ষয় হয়, সেই নারকীয় চিন্তাই শারীরিক ব্যাধির নিদান।

অতএব সংসারী ব্যক্তি সর্ব্বদা পারমার্থিক ধ্যান করিতে পারিবে না বলিয়া তাহাদের পক্ষে একেবারেই ধ্যানযোগ ত্যাগ করা কর্ত্তব্য নহে। যাহার যে পরিমাণ সুযোগ আছে, তাহার পক্ষে সেই সুযোগই অবলম্বন করিয়া জীবনের উন্নতি সাধন করা বিহিত।

৬৯ প্র। কিন্তু সাংসারিক ব্যক্তিরা পশ্বাচার অবলম্বন করিয়া ধ্যানযোগ সাধন

করিলে সাংসারিক অবস্থার অনুন্নতির সম্ভাবনা। যেহেতু ধ্যানযোগ অবলম্বন করিলেই সংসারে ক্রমশই বীতরাগ হইবার সম্ভাবনা এবং তদ্রূপে বীতরাগ হইলেই সাংসারিক অবস্থার উন্নতি-সাধনেও অপ্রবৃত্তির সম্ভাবনা।

উ। সাংসারিক মোহে অভিভূত থাকিলে বাস্তবিক সংসারের উন্নতি হয় না। অনেক অর্থ সঞ্চয় করিয়া সৎকার্য্যে দান করিলে আপাততঃ আমরা সংসারের উন্নতি হইতেছে মনে করি বটে, কিন্তু আমরা সেই অর্থসঞ্চয়ের পদ্ধতির প্রতি মনোযোগ দিয়া দেখি না যে, তদ্দ্বারা সংসারের কত অবনতি হইতেছে। ফলতঃ গোরু মারিয়া জুতা দান যেমন প্রশস্ত নহে, তেমনই আপাততঃ সৎকার্য্য বলিয়া প্রতীত অনেক কার্য্যের হেতুও প্রশস্ত নহে।

অতএব প্রবঞ্চনা, প্রতারণা, বিশ্বাসঘাতকতা, চৌর্য্য প্রভৃতি পাপে লিপ্ত থাকিয়া রাশীকৃত অর্থসঞ্চয় করিয়া বার মাসে তের পার্ব্বণে ব্যয় করিয়া বাহাদুরী লাভ করিলেই জীবনের সদ্ব্যবহার বা সাংসারিক-জীবনের উন্নতি করা হয় না।

সংসারে যাহার শরীর সুস্থ আছে, এবং মন পবিত্র আছে, সে যদি অর্থাভাবজন্য সাংসারিক কোন সৎকার্য্য করিতে না পারে, তাহা হইলেও তাহার ঐহিক বা পারত্রিক কোন ক্ষতি হয় না। কিন্তু যে ব্যক্তি অসদুপায়ে প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করিয়া স্বয়ং নানা ব্যাধি ভোগ করে ও নানা উদ্বেগে কালযাপন করে, অথচ দরিদ্রদিগকে দান করিয়া থাকে এবং নানাবিধ সৎকার্য্যেও ব্যয় করে, প্রকৃতপ্রস্তাবে তাহার ইহলোক ও পরলোক

উভয়ই নষ্ট হয়। যেহেতু তাহার পাপের ধন প্রায়শ্চিত্তে ব্যয়িত হয় বটে, কিন্তু তাহার ঐহিক ও পারত্রিক সুখের কিছুই থাকে না।

অতএব সংসারী ব্যক্তি যোগসাধন করিলে সংসারে অনুন্নতি হয়, ইহা মনেও করিও না।

ফলতঃ সংসারী ব্যক্তিরা যদি যোগসাধন করে, তবে সংসারের সুখৈশ্বর্য্য বৃদ্ধিই পায়।

৭০ প্র। সংসারী ব্যক্তিরা যদি স্বেচ্ছানুসারে আহার-বিহার না করিতে পারে, যদি তাহারা স্বেচ্ছানুসারে স্ত্রীসম্ভোগ করিতে না পারে, তবে তাহারা সুখী হইবে কিরূপে?

উ। স্বেচ্ছাচারিতায় কি সুখ আছে? স্বীয় রাজসিক ও তামসিক প্রবৃত্তির অধীন হইয়া কার্য্য করিলে শেষে সুখের আশয়ে জলাঞ্জলি দিয়া যে দুঃখে নিমজ্জিত হইতে হয়, ইহা আর কত বলিব? স্বেচ্ছানুসারে আহার-বিহার করিলেই রোগে আক্রান্ত হইতে হয়; স্বেচ্ছানুসারে স্ত্রীসম্ভোগ করিলেই রোগে পীড়িত হইতে হয়।

১৪৪০ মিনিটে এক দিন হয়; যে ব্যক্তি এক মিনিট সুখভোগ করিয়া তজ্জন্য অন্ততঃ এক দিনও দুঃখ ভোগ করে, তাহাকে কি সুখী বলা যায়? যে ব্যক্তি এক টাকা লাভ করিবার জন্য ১৪৪০ টাকা ক্ষতি করে, তাহাকে কি লাভবান্ বা বুদ্ধিমান্ বলা যায়? স্বেচ্ছাচারজনিত সুখের পরিণামও ঠিক্ তদ্রূপ। অর্থাৎ এক মিনিট সুখ ভোগ করিলেই অন্ততঃ এক দিন দুঃখ ভোগ করিতে হয়। এই সুখের মোহকেই পণ্ডিতেরা অবিদ্যা বা মায়া বলিয়া গিয়াছেন।

সংসারী ব্যক্তিরা মায়াবশে যে মোহান্ধ, সে কথা যথার্থ; সেই জন্যই তাহারা মৎস্যমাংসমৈথুন পরিত্যাগ করিতে হইলেই সর্ব্বনাশ হইল বলিয়া মনে করে।

যাহা হউক্, যাহারা যোগসাধন বা পশ্বাচার পালন করিবে, তাহারা শারীরিক স্বাস্থ্য ও মনের সন্তোষ লাভ করিয়াই সুখী হইতে পারিবে। সেই স্বাস্থ্য ও সন্তোষ অপেক্ষা জগতে উচ্চ প্রার্থনীয় আর কিছুই নাই। এ সংসারে যে সুখের আশয়ে স্বেচ্ছাচার অবলম্বন করে, এবং শারীরিক স্বাস্থ্য ও মনের সন্তোষ হারায়, তাহার অপেক্ষা হতভাগ্য আর কে আছে ?

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন,—

"ত্রিবিধং নরকস্যেদং দ্বারং নাশনমাত্মনঃ।
কামঃ ক্রোধস্তথা লোভস্তস্মাদেতত্ত্রয়ং ত্যজেৎ ॥
এতৈর্বিমুক্তঃ কৌন্তেয় তমোদ্বারৈস্ত্রিভির্নরঃ।
আচরত্যাত্মনঃ শ্রেয়স্ততো যাতি পরাং গতিম্ ॥
যঃ শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য বর্ত্ততে কামচারতঃ।
ন স সিদ্ধিমবাপ্নোতি ন সুখং ন পরাং গতিম্ ॥
তস্মাচ্ছাস্ত্রং প্রমাণন্তে কার্য্যাকার্য্যব্যবস্থিতৌ।
জ্ঞাত্বা শাস্ত্রবিধানোক্তং কর্ম্ম কর্ত্তুমিহার্হসি ॥"

অর্থাৎ, কাম, ক্রোধ এবং লোভ, এই তিনটী নরকের (দুঃখযন্ত্রণা ও অশান্তির) দ্বারস্বরূপ; এবং আত্মজ্ঞান বিনাশের হেতুস্বরূপ; অতএব এই তিনটী পরিত্যাগ করিবে।

হে অর্জ্জুন, যে ব্যক্তি নরকের দ্বারস্বরূপ উক্ত কাম-

ক্রোধলোভ ত্যাগ করেন, তিনি ইহলোকে মঙ্গল লাভ করিয়া পরলোকে পরমগতি প্রাপ্ত হন।

যে ব্যক্তি শাস্ত্রবিহিত বিধি উল্লঙ্ঘন করিয়া স্বেচ্ছাচারী হয়, তাহার কখনও মনোরথ পূর্ণ হয় না; সে ইহলোকেও সুখে বঞ্চিত হয়, পরলোকেও দুর্গতি প্রাপ্ত হয়।

অতএব কি কর্ত্তব্য কি অকর্ত্তব্য তাহা অবধারণ করিতে হইলে তুমি শাস্ত্রবিধিই প্রমাণস্বরূপে গ্রহণ করিবে; এবং সংসারে থাকিয়া শাস্ত্রবিহিত কার্য্যেরই অনুষ্ঠান করিবে।

এক্ষণে বুঝিয়া দেখ, গুরুবাক্য অতিক্রম করিলে কেহই ইহ সংসারে সুখী হইতে পারে না এবং পরকালেও উত্তম গতি লাভ করিতে পারে না।

ফলতঃ যদি স্বেচ্ছাচারিতায় প্রকৃত সুখলাভ হইত, তাহা হইলে নীতিশাস্ত্র, ধর্ম্মশাস্ত্র বা যোগশাস্ত্রের কোন প্রয়োজনই থাকিত না। স্বেচ্ছাচারিতা হইতে রক্ষা করিবার জন্যই শাস্ত্রকারগণ ভূরি ভূরি উপদেশ দিয়া গিয়াছেন।

যে দুষ্ট দুর্ম্মতি বালক পিতামাতাশিক্ষক প্রভৃতি গুরুজনগণের বাক্যে অবহেলা করিয়া স্বেচ্ছাচার অবলম্বন করে, পরিণামে তাহার যেরূপ দুর্গতি হইয়া থাকে, তেমনই সংসারে যে ব্যক্তি শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট উপদেশবাক্যে অবহেলা করিয়া আহার-বিহার সম্বন্ধে স্বেচ্ছাচার অবলম্বন করে, তাহারও পরিণামে তদ্রূপ দুরবস্থা ঘটিয়া থাকে।

অগাধ অতীত কাল হইতে মহামনীষিগণ যে সকল ব্যবস্থা সুখজনক বলিয়া বিধিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, সেই সকল পরীক্ষাসিদ্ধ প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ ব্যবস্থা লঙ্ঘন করিয়া যাহারা সুখলাভের প্রত্যাশা করে, তাঁহারা মহামোহান্ধ ও হতভাগ্য; অতএব সংসারে কেহই স্বেচ্ছাচারী হইয়া সুখী হইতে পারে না।

চতুর্থ অধ্যায়।

যোগৈশ্বর্য্য সম্বন্ধে।

৭১ প্র। ভগবন্, শুনিয়াছি যোগসাধনে ঐশ্বর্য্য বা প্রভাব লাভ করা যায়; সেই প্রভাব বা ঐশ্বর্য্য কিরূপ? এবং কি জন্যই বা তাহা লব্ধ হয়? মন্ত্রযোগ সাধনা দ্বারা সেই প্রভাব লব্ধ হয় কি না?

উ। যে ব্যক্তি শরীরকে দৃঢ় ও সামর্থ্যময় করিতে ইচ্ছা করে অর্থাৎ যে "পালোয়ান্" হইতে ইচ্ছা করে, সে ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া অর্থাৎ স্বীয় বীর্য্যরক্ষা করিয়া নিয়ত শারীরিক ব্যায়াম করিয়া থাকে; সে অবিরত শরীরসঞ্চালন ও ভারবহনাদি করিয়া শেষে এরূপ শারীরিক শক্তি লাভ করে যে, তাহা দেখিয়া সাধারণ ব্যক্তিরা বিস্ময়ান্বিত হইয়া থাকে। ইহার নাম শারীরিক প্রভাব।

যোগীরাও তদ্রূপ মানসিক প্রভাব লাভ করিয়া থাকেন। পরমাত্মা বা পরমেশ্বর সর্ব্বজ্ঞ; জীবাত্মাও

সেই পরমাত্মার অংশ; তথাপি জীবাত্মা অন্তঃকরণের মলিনতা ও চঞ্চলতাহেতু অজ্ঞানতা দ্বারা আচ্ছন্ন। কিন্তু অন্তঃকরণ যতই রজোমল ও তমোমল হইতে বিনির্ম্মুক্ত হইয়া বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণে উজ্জ্বল বা স্বচ্ছ হয়, জীবাত্মার জ্ঞান ততই প্রকাশিত হয়। সেই প্রকাশিত জ্ঞানের নামই প্রভাব।

ভগবান্ সর্ব্বজ্ঞ, তিনি মায়ার অধীন নহেন অর্থাৎ অজ্ঞানতা তাঁহাকে আচ্ছন্ন করিতে পারে না, তথাপি ক্ষুদ্রবুদ্ধি মানবের অজ্ঞাত কোন কারণহেতু সেই ভগবান্‌ও "ইচ্ছাময়" হইয়া মায়ার সৃষ্টি করিয়া থাকেন। অর্থাৎ ভগবানের ইচ্ছাতেই এই বিশ্বজগৎ উৎপন্ন হইয়াছে। কেন যে ভগবান্ ইচ্ছাময় হন, এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া মানবের অসাধ্য। যেহেতু মানবজ্ঞান যতই উৎকর্ষপ্রাপ্ত বা উজ্জ্বল হউক্ না কেন, তথাপি তাহা উপাধি দ্বারা সীমাবদ্ধ; সুতরাং সেই সসীম জ্ঞান অসীম জ্ঞানের সকল তত্ত্ব অবধারণে সমর্থ নহে।

তবে যোগীরা যোগলব্ধ উজ্জ্বল জ্ঞানের প্রভাবে স্ব স্ব অন্তঃকরণের ইচ্ছাশক্তিরও প্রভাব অনুভব করিয়া বা প্রত্যক্ষ করিয়া পরমেশ্বরকেও "ইচ্ছাময়" বা "বাঞ্ছাকল্প-তরু" বলিয়া অবধারণ করিয়াছেন।

যোগীরা যোগসাধনা দ্বারা অতি অদ্ভুত "ইচ্ছাশক্তি" (Will-force) লাভ করিয়া থাকেন। অর্থাৎ ইচ্ছামাত্রেই তাঁহাদের ইচ্ছা সফল হইয়া থাকে। ইহারই নাম যোগৈশ্বর্য্য বা যোগপ্রভাব।

সকলের সাধনা সমান নহে; সুতরাং সকলের প্রভাবও সমান নহে। অতএব কাহারও অসম্ভব বা অসঙ্গত ইচ্ছা সফল হয় না, এ কথা বলাই বাহুল্য।

সামান্য সাধনা দ্বারা সামান্য ইচ্ছাই সফল করা যায়।

মন্ত্রযোগ সাধনা দ্বারাও যে প্রভাব বা ঐশ্বর্য্য লাভ করা যায়, এ কথা বলাই বাহুল্য। কিন্তু জানিও যে, সেই প্রভাবলাভের লোভে যোগ-সাধনা করিলে সে সাধনা আশু ফলদায়ক হয় না। ফলতঃ যোগপ্রভাব লাভ করিব, এইরূপ বাসনা ত্যাগ করাই কর্ত্তব্য। যেহেতু সেই বাসনার বশীভূত হইলে পরিশেষে অধোগতি হয়।

৭২ প্র। যোগপ্রভাব লাভের বাসনা করিলে অধোগতি হয় কিরূপে?

উ। কিছুকাল শ্রদ্ধাসহকারে মন্ত্রযোগ সাধনা করিলেই তজ্জনিত প্রভাব বা প্রবল ইচ্ছাসাধনশক্তি লাভ করা যায়; কিন্তু সেই ইচ্ছাসাধনশক্তি লাভ করিয়া তাহাতে প্রলুব্ধ হইলেই শেষে সেই যোগশক্তি হারাইয়া অত্যন্ত দুর্দ্দশাপন্ন হইতে হয়।

৭৩ প্র। ভগবন্! উদাহরণ দ্বারা বুঝাইয়া না দিলে আমি এ কথা ভাল বুঝিতে পারিতেছি না।

উ। ইচ্ছাশক্তির অপর নাম প্রার্থনাশক্তি। যোগসাধন দ্বারা সেই প্রার্থনাশক্তি বা প্রার্থনাপ্রভাব লাভ করা যায়। এই প্রভাব মনের একাগ্রতা সাধনেরই ফল।

মনে কর, তুমি মন্ত্রযোগ দ্বারা এই প্রভাব কিছু পরিমাণে লাভ করিয়াছ; তোমার প্রতিবেশী বা জ্ঞাতি কোন ব্যক্তি সাংসারিক মায়াবশে তোমার অনিষ্ট-চেষ্টা করি-

তেছে এবং নানাপ্রকারে তোমাকে কষ্ট দিবার চেষ্টাও করিতেছে, তথাপি তুমি কখনও তাহার অপকার-চেষ্টা কর না, বরং তাহার মঙ্গল-কামনাই করিয়া থাক। ইহাতে তোমার মানসিক প্রভাব আরও বৃদ্ধি পাইতেছে। কিন্তু অত্যন্ত উত্তেজনার কারণ উপস্থিত হওয়াতে তুমি হয় ত মনের স্থৈর্য্য রক্ষা করিতে অসমর্থ হইয়া একদিন হঠাৎ তাহার অনিষ্ট প্রার্থনা করিলে। তোমার সাধনার শক্তি অনুসারে সেই অনিষ্ট-কামনা অতি সত্বর বা কিছু বিলম্বে পূর্ণ হইবেই হইবে। তোমার সেই অনিষ্ট-কামনা পূর্ণ হইতে দেখিয়া যদি তুমি হৃষ্ট হও, তাহা হইলে এইরূপ অনিষ্ট-প্রার্থনায় তুমি প্রলুব্ধ হইয়া পড়িবে। তাহা হইলেই তোমার সাত্ত্বিক সাধনার ফল ক্রমশঃ রাজসিক ও তামসিক ভাবে বিনষ্ট হইবে। সুতরাং তখন তোমার অধোগতি হইবে।

৭৪ প্র। যোগপ্রভাব লাভ করিয়া কাহারও অনিষ্ট-কামনা করিলে সেই কামনা নিশ্চয়ই সফল হয়? ইহার কারণ কি?

উ। যোগপ্রভাব লাভ করিয়া ইষ্টকামনা বা অনিষ্ট-কামনা উভয়ই সিদ্ধ করা যায়। ইহা যোগলব্ধ প্রার্থনাশক্তির ফল। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আতসী পাতরে সূর্য্যরশ্মি কেন্দ্রীভূত হইলেই অগ্নিতুল্য প্রভাব বিশিষ্ট হয়, তদ্রূপ যোগীরাও একাগ্রতা দ্বারা অলৌকিক প্রভাব লাভ করিয়া থাকেন। একাগ্রতা দ্বারা কেন বা কিরূপে যে এই প্রভাব লব্ধ হয়, তাহা সীমাবদ্ধ মানববুদ্ধি সম্যক্ অবধারণে সমর্থ নহে। চুম্বক লৌহকে আকর্ষণ করে কেন?

স্থূল জগতের এই সামান্য ব্যাপারের মীমাংসা করিতে মানুষ অসমর্থ; অতএব মানসিক সূক্ষ্ম জগতের ব্যাপার সম্যক্ অবধারণ করা অতীব দুঃসাধ্য। যে সকল উন্নত যোগী সেই সকল সূক্ষ্ম ব্যাপারের নিগূঢ় কারণ অবগত আছেন, তাঁহারাও এ বিষয়ে মৌনাবলম্বী; সুতরাং আমি তোমার এই কারণ জিজ্ঞাসার উত্তর দিতে সমর্থ নহি।

এইমাত্র জানিয়া রাখ যে, ইহা প্রার্থনাশক্তি বা ইচ্ছা-শক্তির কার্য্য। আর প্রার্থনাশক্তি যোগসাধনের বা একাগ্রতাসাধনের ফল।

এই ইচ্ছাশক্তির প্রভাব তির্য্যগ্ জগতেও দৃষ্টিগোচর হয়। নিশ্চল ও নিশ্চেষ্ট অজগর সর্পসকল এই ইচ্ছা-শক্তির প্রভাবেই খাদ্য আহরণ করে। অর্থাৎ তাহাদের মনের একাগ্রতার প্রভাবেই নানাবিধ জন্তু তাহাদের মুখে আসিয়া পতিত হয়। ইহা ভূরি পরীক্ষাসিদ্ধ ব্যাপার।

সম্প্রতি কিছুদিন গত হইল, "মেস্মার" নামক এক জন জর্ম্মান্ পণ্ডিত ঘটনাক্রমে এক অজগরের ইচ্ছাশক্তির প্রভাব দেখিয়া স্বনামপ্রসিদ্ধ অর্থাৎ "মেস্মেরিজম্" নামে খ্যাত বশীকরণ-বিদ্যার আবিষ্কার করিয়াছেন। অধুনা বশীকরণবিদ্যার জন্য পাশ্চাত্য জগতে এক বিষম যুগান্তর উপস্থিত হইয়াছে। মেস্মার স্বীয় জীবনবৃত্তে এইরূপ লিখিয়াছেন যথা;—

"আমি একদা পোতারোহণে বিদেশে গমন করিয়া-ছিলাম। দৈবদুর্ব্বিপাকে জাহাজ জলমগ্ন হইয়াছিল। কিন্তু কেবল আমিই ঈশ্বরকৃপায় পরিত্রাণ পাইয়াছিলাম।

জাহাজের ভগ্ন মাস্তুল অবলম্বন করিয়া আমি তীরে উত্তীর্ণ হইয়াছিলাম, উপরে পাহাড় ও জঙ্গল ছিল। আমি হিংস্র জন্তুর ভয়ে বৃক্ষারোহণ করিয়া রাত্রিযাপন করিলাম। পরদিন প্রাতঃকালে বৃক্ষ হইতে অবতরণ করিবার সময় দেখিলাম নিম্নে একটা বৃহৎ সর্প মৃতবৎ পতিত রহিয়াছে। আমি তাহাকে দেখিয়া বৃক্ষ হইতে অবতরণ করিতে সাহস করিলাম না। বেলা ক্রমশঃ অধিক হইল, তথাপি সেই সর্প স্থানান্তরে গেল না। অন্যূন ৪ ঘণ্টা পরে দেখিলাম, আকাশ হইতে ২।৩ টা পক্ষী তাহার সম্মুখে পতিত হইল। সর্প তাহাদিগকে ভক্ষণ করিল। ক্রমে আরও দুই চারিটা ক্ষুদ্র জন্তু তাহার মুখের নিকট আসিল, সাপ তাহাদিগকেও ভক্ষণ করিল। তদনন্তর সে ক্রমশঃ শরীর-সঞ্চালন আরম্ভ করিল এবং স্থানান্তরে গমন করিল।

আকাশের পাখী কেন তাহার মুখে পড়িল? কি কারণে দূরস্থ ক্ষুদ্র জন্তু তাহার মুখের নিকট আসিল? আমি এই চিন্তায় নিমগ্ন হইলাম। চিন্তা করিতে করিতে আমার মস্তিষ্ক বিকল হইল; আমি পরিশেষে স্থির সিদ্ধান্ত করিলাম যে, অজগর সর্পগণ স্বাভাবিক ইচ্ছাশক্তির প্রভাবেই এইরূপে আহার সংগ্রহ করিয়া থাকে। এবং মনের একাগ্রতাই এই প্রবল ইচ্ছাশক্তির হেতু।"

যোগীদিগের একাগ্রতা "সংযম" বলিয়া খ্যাত। সেই সংযম প্রভাবেই যোগীরা অনেক অলৌকিক কার্য্য সম্পাদন করিতে পারেন।

৭৪ প্র। যোগ-প্রভাবে যদি প্রমুক্ত না হওয়া যায়, তবে ত তদ্দ্বারা সংসারে অনেক মহৎ উদ্দেশ্যও সাধন করা যায় ?

উ। হাঁ, যোগপ্রভাবে সাংসারিক অনেক সদুদ্দেশ্য সাধন করা যায়, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই।

যোগীরা প্রার্থনাশক্তির প্রভাবেই অন্যকে অভিশাপ দিয়া তাহার অনিষ্ট সাধন করিতে পারেন, আবার আশীর্ব্বাদ করিয়াও অন্যের মঙ্গল সাধন করিতে পারেন। কিন্তু অভিশাপ দ্বারা অভিশপ্ত ব্যক্তি ও অভিশাপদাতা উভয়েরই অনিষ্ট হয়; এবং তাহাতে জগতেরও অনেক ব্যক্তির অনেক অনিষ্ট হয়; আর আশীর্ব্বাদ দ্বারা সকলেরই মঙ্গল হইয়া থাকে।

যোগপ্রভাবে অনায়াসে পীড়িত ব্যক্তির পীড়াশান্তি করা যায়। চিকিৎসক বিস্তর চেষ্টা করিয়া বিস্তর ঔষধ প্রয়োগ করিয়া যে রোগ প্রশমিত করিতে না পারেন, যোগীরা সেই রোগ স্বীয় প্রার্থনাশক্তি বা আশীর্ব্বাদ দ্বারা উপশমিত করিতে পারেন। এই জন্যই যোগীরা অতি সামান্য দ্রব্য দ্বারাও দুরূহ রোগ নিবারণ করিয়া থাকেন।

যোগীরা ইচ্ছাশক্তি প্রভাবে পরস্পর বিবদমান শত্রু-দিগকেও মিত্ররূপে পরিণত করিয়া সংসারে শান্তি স্থাপন করিতে পারেন।

তুমি যদি কিছুদিন যোগসাধন কর, তাহা হইলে সাধুসঙ্গলাভ তোমার ইচ্ছাশক্তির আয়ত্ত হইবে; অর্থাৎ তুমি মানসিক প্রার্থনা করিলেই তোমার সমীপে সাধু,

মহাত্মারা উপস্থিত হইয়া তোমার জ্ঞানলিপ্সা বা আন্তরিক কোন অভাব মোচন করিবেন।

এইরূপেই যোগপ্রভাবে সংসারের উন্নতি সাধন করা যায়। অন্তঃকরণে যোগপ্রভাব প্রতিষ্ঠিত হইলেই এইরূপ মনে হইবে যথা;—"এ সংসারে আমার কিছুরই অভাব নাই, এবং ভবিষ্যতেও আমার কিছুরই অভাব হইবে না।" এইরূপ ভাবনার ফলে অন্তঃকরণ পরম সন্তোষের আধার হইবে এবং মন নিরুদ্বেগ ও নির্ভয় হইবে। তখন মৃত্যুভয়ও অন্তঃকরণ হইতে অপনীত হইবে। ইহাই পরম শান্তি বা পরম নির্ব্বৃতির অবস্থা; এবং এই অবস্থারই নাম জীবন্মুক্তি।

৭৬ প্র। যোগসাধন করিয়া মনের একাগ্রতা লব্ধ হইলেই প্রার্থনা সফল হইয়া থাকে; কিন্তু সেই প্রার্থনা কিরূপে করিতে হইবে? অর্থাৎ কি প্রকারে প্রার্থনা করিলে প্রার্থনা সহজে সফল হয়? অত্যন্ত আগ্রহসহকারে কি ইষ্ট দেবতার নিকট প্রার্থনা করিতে হইবে?

উ। বৎস, এইবার তুমি অতি উৎকৃষ্ট প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছ, এই প্রশ্নের উত্তর দিতে আমাকে অতি গুহ্য যোগরহস্য প্রকাশ করিতে হইবে, অতএব মনোযোগ দিয়া শুন;—

মনেকর, তোমার দ্বারে একজন ক্ষুধার্ত্ত কাঙাল আসিয়া অতি আগ্রহসহকারে বলিতেছে "বাবা আমাকে কিছু খাইতে দাও, নতুবা আমি এখনই মরিয়া যাইব, আমি ক্ষুধার ক্লেশ সহ্য করিতে পারিতেছি না, ইত্যাদি।" আর একজন তদ্রূপ ক্ষুধার্ত্ত কাঙাল আসিয়া তোমার মুখের দিকে চাহিয়া আছে, কিন্তু কিছুই বলিতেছে না,

সে তোমারই ইচ্ছার উপর নির্ভর করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। এখন বিবেচনা করিয়া বলদেখি, কোন্ প্রার্থীর প্রার্থনা তোমার অন্তঃকরণকে অধিকতর বলে আকর্ষণ করিবে? যে সকাতরে সাগ্রহ চীৎকার করিতেছে, সে তোমার অন্তঃকরণকে অতি অল্পমাত্রই বিচলিত করিবে; কিন্তু যে নীরবে প্রার্থনা করিতেছে, সে তোমার অন্তঃকরণকে অতি প্রবলভাবে বিচলিত করিবে। ইহা সচরাচর পরীক্ষা-সিদ্ধ ব্যাপার। বাহ্য জগতের এই ব্যাপারের সহিত অন্তর্জগতেরও সাদৃশ্য আছে।

অতএব, যদি তুমি আগ্রহ সহকারে অর্থাৎ নির্ব্বন্ধ সহকারে বা জেদ্ করিয়া ইষ্টদেবতার কাছে পুনঃ পুনঃ প্রার্থনা কর, তোমার সে প্রার্থনা তাদৃশ ফলদায়ক হইবে না। কিন্তু যদি তুমি নীরবে কেবল ইষ্টদেবতার ইচ্ছার প্রতি নির্ভর করিয়া থাক, তাহা হইলে তোমার প্রার্থনা অতি সত্বর সফল হইবে।

অতএব ইচ্ছাকে বা কামনাকে যতই দমন করিবে, ততই তাহার সাফল্যলাভের শক্তি বৃদ্ধি পাইবে। উদাহরণ দ্বারা এই বিষয়টী বুঝাইয়া দিতেছি শুন;—

মনেকর তোমার একমাত্র প্রিয়তম পুত্র সাংঘাতিক রোগে পীড়িত হইয়াছে। পাছে তাহার মৃত্যু হয়, এই আশঙ্কা করিয়া যদি তুমি সকাতরে আগ্রহ সহকারে ইষ্ট দেবতার নিকট প্রার্থনা কর, তাহা হইলে হয় ত ইষ্টদেবতা তোমার মনের মোহ নিবারণ করিবার জন্য এই পুত্রটীকে শীঘ্রই যমালয়ে প্রেরণ করিবেন।

কিন্তু যদি তুমি নির্ম্মমভাবে—নিতান্ত উদাসীনভাবে—মনের উদ্বেগ ত্যাগ করিয়া ইষ্টদেবতার উপর নির্ভর কর, এবং "পুত্রের জীবন্মৃত্যু আমার ইচ্ছাধীন নহে, পুত্র মরিতে হয় মরুক্, থাকিতে হয় থাকুক্" এইরূপ সিদ্ধান্ত দ্বারা দৃঢ়াকৃত, অন্তঃকরণে যদি তুমি স্বীয় নিত্যক্রিয়ায় অর্থাৎ মন্ত্রযোগে নিবিষ্ট থাক, তাহা হইলে যমদূতের কথা দূরে থাক্, স্বয়ং যম আসিয়াও তোমার পুত্রের দেহ স্পর্শ করিতে সমর্থ হইবে না!! তোমার স্বতঃসিদ্ধ বা প্রকৃতিলব্ধ যে পুত্রস্নেহ অন্তঃকরণের অতি নিগূঢ় স্থানে নিহিত আছে—যে স্নেহকে তুমি কৃত্রিম উপায়ে দমন করিয়া রাখিয়াছ, সেই নিপীড়িত স্নেহের অস্ফুট প্রার্থনাই তোমার পুত্রকে মৃত্যুর হস্ত হইতে রক্ষা করিবে।

সতী সাবিত্রী এইরূপ প্রার্থনাপ্রভাবেই স্বীয় পতি সত্যবান্‌কে সঞ্জীবিত করিয়াছিলেন। সাবিত্রী পতির অবধারিত মৃত্যুদিন অবগত ছিলেন। কালের অব্যর্থ নিয়ম দুরতিক্রম্য বলিয়াও তাঁহার দৃঢ়বিশ্বাস ছিল। সেই জন্যই তিনি পতিকে জীবিত করিবার আশা করেন নাই। তিনি পতির মৃত্যুর পরেই স্বীয় প্রাণ পরিত্যাগে সঙ্কল্পারূঢ় হইয়াছিলেন। সেই জন্যই তিনি উপবাসী হইয়া সমস্ত দিন ধ্যানযোগে নিমগ্না ছিলেন। তিনি মৃতপতিকে ক্রোড়ে স্থাপন করিয়া একান্তচিত্তে কালের প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। তখন তাঁহার কোনরূপ প্রার্থনাই ছিল না। সুতরাং এরূপ অবস্থায় জ্ঞানবতী তপস্বিনী সাবিত্রীর অন্তরের নিগূঢ় স্থানে আবদ্ধ বা লুক্কায়িত মায়া-

জনিত প্রার্থনা পার্থিব স্বার্থসাধনে সহজেই কৃতকার্য্য হইয়াছিল। ইহাতে কিছুমাত্র বিস্ময়ের বা অবিশ্বাসের বিষয় নাই। ইহা সামান্য যোগ-সাধনের সহজাত প্রভাব।

ফলতঃ মায়ামিশ্রিত পার্থিব স্বার্থসাধন সামান্য যোগ-সাধনেরই আয়ত্ত। মায়াপ্রভাবে স্নেহাদির অধীন একজন যোগীও অনায়াসে এইরূপ ভাবে আসন্নমৃত্যু ব্যক্তিকেও পুনর্জ্জীবিত করিতে পারেন। (পরমযোগীরা বা পরমহংসেরা কখনও এরূপ করেন না, কেননা তাঁহারা স্নেহ-মমতার অধীন নহেন)।

যাহা হউক্, পার্থিব স্বার্থসাধন বা পরোপকার সাধন বা সংসারের উপকার সাধন করিতে হইলে সাগ্রহ প্রার্থনা করা দূরে থাক্, কিছুমাত্র প্রার্থনা না করাই কর্ত্তব্য। প্রার্থনাকে যতই পরিত্যাগ করিতে চেষ্টা করিবে—স্বীয় অন্তঃকরণের বাসনাকে যতই দমন করিতে চেষ্টা করিবে, সেই নিপীড়িত প্রার্থনার সিদ্ধিলাভশক্তি ততই বর্দ্ধিত হইবে।

অতএব যদি পার্থিব স্বার্থ লাভ করিতে চাও, তবে স্বার্থ ত্যাগের চেষ্টা কর; ইহা অন্তর্জগতের এক অতি বিচিত্র অদ্ভুত রহস্য! এই অদ্ভুত রহস্যের বিষয় যাঁহারা জানেন, তাঁহারাই যোগসাধনে সহজে ঐশ্বর্য্য বা প্রভাব বা প্রার্থনাশক্তি লাভ করিয়া থাকেন।

৬৭ প্র। তবে কি পুত্রাদির পীড়া হইলে আরোগ্যের জন্য চেষ্টা করা উচিত নহে? কেবল ইষ্টদেবতার প্রতি নির্ভর করিয়া নিশ্চিন্ত বা নিশ্চেষ্ট থাকাই কর্ত্তব্য? তবে ইতঃপূর্ব্বে (যোগসাধন দ্বিতীয়ভাগে) যে পুরুষকারের মহিমা বর্ণিত হইয়াছে, তাহা কিরূপে সঙ্গত হইবে?

যখন ইষ্টদেবতার প্রতি যথার্থ ভক্তির উদয় হইবে, যখন ইষ্টদেবতাকেই সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়ের একমাত্র কর্ত্তা বলিয়া দৃঢ়বিশ্বাস জন্মিবে, তখন যোগীর পক্ষে অন্যবিধ চেষ্টা অকিঞ্চিৎকর বলিয়া গণ্য।

কিন্তু যতদিন তদ্রূপ দৃঢ়ভক্তি ও দৃঢ়বিশ্বাস না জন্মিবে, ততদিন অগত্যা অন্যবিধ চেষ্টা করিতেই হইবে, ইহাতে কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নির্দ্দেশ বৃথামাত্র। যতদিন ইষ্টদেবতার প্রতি তোমার যথার্থ শ্রদ্ধার উদয় না হইবে, ততদিন তোমার চঞ্চল ও মোহান্ধ চিত্ত তোমাকে ব্যতিব্যস্ত করিবেই করিবে।

পুরুষকার ব্যতীত কেহই চেষ্টা করিতে পারে না; কিন্তু চেষ্টা নানাপ্রকার। দুশ্চেষ্টাও চেষ্টা বলিয়া গণ্য; অনর্থক বা অফলদায়ক চেষ্টাও চেষ্টার মধ্যে গণ্য; কিন্তু যোগসাধন অপেক্ষা এ সংসারে সুফলদায়ক চেষ্টা কিছুই নাই।

একটা মত্ত-মাতঙ্গকে প্রজ্বলিত মশাল ধরিয়া তাড়না করিয়া তৎপশ্চাৎ ছুটাছুটি করা ভাল, কি তাহাকে কৌশলে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া রাখা ভাল? ইহার মধ্যে কোন্ প্রকার চেষ্টা সুচেষ্টা বলিয়া গণ্য? এখানে মনকেই মত্ত-মাতঙ্গ বলিয়া বুঝ এবং উদ্বেগকেই জ্বলন্ত মশাল মনে কর। রাজসিক উদ্বেগ দ্বারা মনকে ছুটাইয়া লইয়া বেড়াইলে সংসারে বা পরলোকে কোন উপকারই পাওয়া যায় না; কিন্তু যোগ দ্বারা সেই মত্তমাতঙ্গরূপ মনকে শৃঙ্খলিত বা স্থিরীভূত করিলে ইহ-পারলৌকিক অশেষ মঙ্গল লব্ধ হইয়া থাকে।

অতএব পুত্রাদির পীড়া হইলে যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়া মনকে অগ্রে নিরুদ্বেগ করা কর্ত্তব্য; তৎপরে অন্যবিধ যে কোন চেষ্টা করিতে হয় করা কর্ত্তব্য। মনস্থৈর্য্যই তোমার প্রবল পুরুষকার সাপেক্ষ জানিবে। প্রবল পুরুষকার ব্যতীত কেহই চিত্তচাঞ্চল্য নিবারণে সমর্থ হয় না। আর চিত্তচাঞ্চল্য নিবারণ অপেক্ষা মহাফলপ্রদ চেষ্টা আর নাই। অতএব মনের উদ্বেগ পরিহার করা অর্থাৎ নিশ্চিন্ত হওয়া নিশ্চেষ্টতার ফল নহে। প্রত্যুত ইহা মহাচেষ্টার ফল; সেই মহতী চেষ্টাও পুরুষকারের ফল। সুতরাং পুরুষকারের মহিমা কখনই অপলাপ করিবার সাধ্য কাহারও নাই।

পুত্রাদির পীড়া হইলে ইষ্টনিষ্ঠ যোগী ডাক্তার-কবিরাজের বাড়ী ছুটিয়া যাওয়া অপেক্ষা স্বীয় হোমগৃহে জপসাধনে নিযুক্ত হওয়া অধিকতর সুফলদায়ক মনে করেন। তিনি স্বীয় হোমগৃহে থাকিয়া ইষ্টদেবতার নিকট যে পরামর্শ পাইবেন, ভ্রষ্টাচার দাম্ভিক ও পুথিগতবিদ্যা সামান্য নগণ্য ডাক্তার-কবিরাজ কি কখনও তদ্রূপ পরামর্শ দিতে সমর্থ হইবে?

৭৮ প্র। ইষ্টদেবতা কিরূপে পরামর্শ দেন, বুঝিতে পারিতেছি না।

উ। "কর্ত্তব্য কি?" এই বিষয়ে সংযম করিলেই যোগীর মনে যথার্থ কর্ত্তব্যজ্ঞান স্বতই উদিত হয়। উহাই ইষ্টদেবতার পরামর্শ জানিবে। ফলতঃ যোগীর হৃদয়েই ইষ্টদেবতা সর্ব্বদা বিরাজিত। অতএব কোন বিষয়েরই পরামর্শ জিজ্ঞাসার জন্য যোগীকে সামান্য সংসারী লোকের

শরণাপন্ন হইতে হয় না। বরং সংসারী ব্যক্তিদের পক্ষে, অভিজ্ঞ ও বুদ্ধিমান্ হইলেও, বিষম সঙ্কটকালে কর্ত্তব্য নিরূপণের জন্য কোন যোগীর শরণাপন্ন হওয়া কর্ত্তব্য।

৭৯ প্র। ভগবন্! আর জিজ্ঞাস্য প্রায় কিছুই নাই, তবে এক্ষণে কৃপা করিয়া বলুন্, কিরূপে ভক্তি লাভ করা যায় এবং কিরূপে ইষ্টদেবতার প্রতি আত্ম-সমর্পণ করা যায়?

উ। নিয়ত স্বাপকর্ষ চিন্তা অর্থাৎ নিজের হীনতা বা দুরবস্থা চিন্তা করিলেই ভক্তির উদয় হয়। অতএব ভক্তিলাভের জন্য সতত এইরূপ চিন্তা করা বিধেয় যথা ;—

আমার শরীরের প্রত্যেক শোণিত-বিন্দুতে লক্ষ জীবাণু প্রতিপালিত হইতেছে। আমিও একদা তদ্রূপ একটী জীবাণু ছিলাম। এখন যদিও আমি মনুষ্যরূপে উন্নতি লাভ করিয়াছি, তথাপি লক্ষ লক্ষ মনুষ্য আমা অপেক্ষা উন্নতি লাভ করিয়াছেন। আবার সেই লক্ষ লক্ষ মনুষ্য অপেক্ষাও কোটি কোটি দেবতারা অধিকতর উন্নত। আবার দেবতাদেরও অপেক্ষা উন্নত মহাত্মা সকল বিদ্য-মান আছেন। অতএব আমার অবস্থা কতই হীন!

এই যে চন্দ্র সূর্য্য-নক্ষত্র-সমন্বিত সৌরজগৎ আমাদের সামান্য দৃষ্টির প্রত্যক্ষ, এই সৌরজগতের তুলনায় পৃথিবী একটী নগণ্য ক্ষুদ্র জগৎ। জ্ঞানীরা বলেন, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে এমন কোটি কোটি সৌরজগৎ বিদ্যমান আছে! অতএব বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের তুলনায় পৃথিবী একটী বালুকণারও তুল্য নহে। আমার ক্ষুদ্রতার পরিমাণ তবে কিরূপে নির্ণয় করিব? তবে ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র ও নীচাদপি নীচ আমার অহঙ্কার-গর্ব্ব কিসের জন্য?" এইরূপ চিন্তাপ্রবাহে

কিছুদিন মনকে ভাসাইলে মনের বৃথা মদগর্ব্ব দূরীভূত হইবে এবং তখন ভক্তির উদয় হইবে।

ঈশ্বরে আত্মসমর্পণ করিতে হইলে নিয়ত নিজের শক্তি-হীনতা বা অসামর্থ্য চিন্তা করা কর্ত্তব্য। যথা ;—

"যখন আমি জননী-জঠরে ছিলাম, তখন কে আমায় প্রতিপালন করিয়াছিলেন ?

মাতৃ-হৃদয়ে কে স্নেহের সঞ্চার করিয়া শৈশবে আমায় প্রতিপালন করিয়াছিলেন ?

আমি এখন কিঞ্চিৎ শক্তিলাভ করিয়া চলিতে বলিতে শিখিয়াছি বলিয়াই কি সেই বিশ্ব-পিতামাতা আমাকে পরিত্যাগ করিয়াছেন ? আর কি আমার প্রতি তাঁহাদের সেই কৃপাদৃষ্টি নাই ? তবে যখন আমি বৃদ্ধাবস্থায় আমার এই সামান্য শক্তিটুকু হারাইব, যখন আমার সমস্ত ইন্দ্রিয় শিথিল হইবে, যখন অতি বিকটবেশে মৃত্যু আসিয়া আমার সম্মুখে উপস্থিত হইবে, তখন আমি আত্মরক্ষার জন্য কোথায় শক্তি পাইব ?" এইরূপ চিন্তাপ্রবাহে নিয়ত মনকে ভাসাইলে মন শেষে নিতান্ত ভীত ও অবসন্ন হইয়া ঈশ্বরের শরণাপন্ন হইবে। এবং পরিশেষে অনন্য-গতি হইয়া সেই ঈশ্বরের প্রতিই আত্মসমর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত ও নির্ভয় হইবে।

৮০ প্র। ভগবন্, যতই জিজ্ঞাসা করা যায়, জিজ্ঞাসাপ্রবৃত্তি ততই প্রবল হয় ; ফলতঃ অজ্ঞানাচ্ছন্ন মন যেন জিজ্ঞাসা করিয়া পরিতৃপ্ত হয় না ; এই জিজ্ঞাসার নিবৃত্তি হইতে পারে কিরূপে ?

উ। বৎস, প্রত্যেক মনুষ্য-হৃদয়েই জ্ঞানলিপ্সা অতি প্রবল ;

সেই জ্ঞানলিপ্সাই জিজ্ঞাসাপ্রবৃত্তির মূল। এই জ্ঞানলিপ্সা বা জিজ্ঞাসাই মনুষ্যের উন্নতি বিধান করে। এই জ্ঞান-লিপ্সা-প্রণোদিত হইয়াই মনুষ্যেরা ধর্ম্মের অন্বেষণ করে। আর ধর্ম্মই মনুষ্যের উন্নতি বিধান করে। অতএব জিজ্ঞাসা-প্রবৃত্তি দূষণীয় নহে। কিন্তু কেবল জানিলে কোন ফললাভ করা যায় না; জানিয়া কাজ করা চাই। কেবল জ্ঞানলাভ করিলেই উন্নতিলাভ হয় না। কার্য্য সাধন না করিলে উন্নতি লাভের সম্ভাবনা নাই। "ক্ষুধার সময় অন্ন আহার করিতে হয় এবং তৃষ্ণার সময় জলপান করিতে হয়" এ কথা জানিয়া রাখিলেই কেহ ক্ষুধার সময় অন্ন এবং তৃষ্ণার সময় জল পায় না। অন্ন এবং পানীয় আহরণ করা আবশ্যক।

অতএব অগ্রে কর্ত্তব্য নিরূপণের জন্য জ্ঞানের প্রয়োজন এবং জ্ঞানের জন্যই জিজ্ঞাসা আবশ্যক। কিন্তু যখন কর্ত্তব্যজ্ঞান লব্ধ হইবে, তখনই কর্ত্তব্য সাধনে সঙ্কল্পারূঢ় হওয়া উচিত। ফলতঃ কর্ত্তব্য সাধনের জন্যই জ্ঞান আবশ্যক, নতুবা জ্ঞান নিরর্থক। এই জন্যই মহাত্মারা বলিয়াছেন,—

"সারভূত মুপাসীত জ্ঞানং যৎ কার্য্যসাধনম্।
জ্ঞানানাং বহুতা যেয়ং যোগবিঘ্নকরী হি সা॥
ইদং জ্ঞেয়মিদং জ্ঞেয়মিতি যস্তৃষিতশ্চরেৎ।
অপি কল্পসহস্রেষু নৈব জ্ঞেয়মবাপ্নুয়াৎ॥

অর্থাৎ কার্য্য-সাধন জ্ঞানই সাদরে গ্রহণ করিবে। অসংখ্য বিষয় জানিবার জন্য ব্যস্ত থাকিলে সাধনার সময়

পাওয়া যায় না, অতএব বহুজ্ঞানের প্রয়োজন নাই। "ইহা জানিব তাহা জানিব" এইরূপে ব্যস্ত থাকিলে লক্ষ লক্ষ জন্ম পরিগ্রহ করিয়াও জ্ঞানলিপ্সা তৃপ্ত হইবে না, কেবল জন্ম-জরা-মরণ-ক্লেশ ভোগ করিয়াই যুগযুগান্তর গত হইবে।"

আবশ্যক জ্ঞান লাভ করিয়া যোগসাধন করিলে জ্ঞান-লিপ্সাও নিবৃত্ত হইবে। যেহেতু যোগসাধনে যে ক্রমো-ন্নতি লব্ধ হয়, সেই উন্নতিকে যোগবিৎ পণ্ডিতেরা সাত ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। তাহা যোগশাস্ত্রে সপ্তভূমি বলিয়া খ্যাত। এই সপ্তভূমির প্রথম ভূমি বা প্রথম উন্নত অবস্থাই "জ্ঞান-তৃপ্তি" অর্থাৎ যোগসাধনে কিঞ্চিৎ উন্নতি লাভ করিলেই সহজে মনে হইবে, "যাহা জ্ঞাতব্য ছিল, তাহা জানিয়াছি, আর আমার কিছুই জ্ঞাতব্য নাই।"

এই জ্ঞানতৃপ্তি লব্ধ হইলেই জিজ্ঞাসা-প্রবৃত্তিও নিবৃত্ত হইবে।

অতএব বৎস, আর জিজ্ঞাসার প্রয়োজন নাই, এক্ষণে কর্ত্তব্য-সাধনে প্রবৃত্ত হও।

"ব্রহ্মচর্য্যমলোভঞ্চ দয়াঽক্রোধঃ সুচিত্ততা।
আহার-লাঘবং শৌচং যোগিনাং নিয়মাঃ স্মৃতাঃ॥"

সংক্ষেপে এইমাত্র নিয়ম সর্ব্বদা স্মরণ রাখিয়া সাধনা কর; তাহা হইলেই শ্রেয়োলাভ হইবে।

সমাপ্ত।